( তৃতীয় খণ্ড )

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# গল্পগুচ্ছ

( তৃতীয় খণ্ড )

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

# সূচীপত্র

# গল্পগুচ্ছ

—·৹·—

## কর্ম্মফল

—৺৺—

### প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সতীশের মাসি সুকুমারী এবং মেসোমশায় শশধরবাবু আসিয়াছেন—সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। "এসো দিদি, ব'সো! আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেলো! দিদি না আস্‌লে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই!"

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কি রকম কড়া! দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন!

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না!

বিধুমুখী। নাকডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কি কাপড় প'রেছিস্? তুই কি এই রকম ধুতি প'রে ইস্কুলে যাস্ না কি? বিধু ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম, সে কি হ'লো?

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে!

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়্‌বেই! ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতোদিন টেঁকে! তা, তাই ব'লে কি আর নূতন ফ্রক্ তৈরি করাতে নেই! তোদের ঘরে সকলি অনাসৃষ্টি!

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখ্‌লেই আগুন হ'য়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুন্‌সি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মাগো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখি নি!

সুকুমারী। মিছে না! এক বই ছেলে নয়—একে একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি! সতীশ, পরশু রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস্, আমি তোর জন্য একসুট্ কাপড় র্যামজের ওখান হ'তে আনিয়ে রাখ্‌বো। আহা ছেলেমানুষের কি স'খ্ হয় না।

সতীশ। একসুটে আমার কি হবে মাসিমা! ভাদুড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপিং খেলায় নিমন্ত্রণ ক'রেছে—আমার তো সে রকম বাইরে যাবার মখ্‌মলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো সতীশ!

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না! ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে, তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা, মশায়, বক্তৃতা ক'র্‌বার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুট্‌তো তবে তোমাদের কি দশা হ'তো বলো দেখি!

শশধর। সে কথা ব'লে লাভ কি! সে অবস্থা কল্পনা করাই ভালো!

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চ'হিয়া) না, না, এখানে আন্‌তে হবে না আমি যাচ্ছি! (প্রস্থান)

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালাল কেনো বিধু?

বিধুমুখী। থালায় ক'রে তার জলখাবার আন্‌ছিলো কি না, ছেলের তাই তোমাদের সাম্‌নে লজ্জা!

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হ'তে পারে! ও সতীশ, শোন্ শোন্! তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্ ক্রিম্ খাইয়ে আন্‌বেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা! ওগো, যাও না ছেলেমানুষকে একটু···

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কি কাপড় প'রে যাবো?

বিধুমুখী। কেনো, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। সে বিশ্রী!

সুকুমারী। আর যাই হোক্ বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা! বাস্তবিক, চাপকান দেখ্‌লেই খান্‌সামা কিম্বা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে! এমন অসভ্য কাপড় আর নেই!

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপিচুপি ব'ল্‌তে হবে? কেনো, ভয় ক'র্‌তে হবে কা'কে! মন্মথ নিজের পছন্দমত ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাবো না!

শশধর। সর্ব্বনাশ! কথা বন্ধ ক'র্‌তে আমি বলি নে! কিন্তু সতীশের সাম্‌নে এ সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ! তুমি ওকে পেলিটির ওখানে নিয়ে যাও!

সতীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান প'রে যেতে পারবো না!

সুকুমারী। এই যে মন্মথবাবু আস্‌চেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি ক'রে ওকে অস্থির ক'রে তুলবেন। ছেলেমানুষ বাপের বকুনির চোটে ওর এক দণ্ড শান্তি নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়··· আমরা পালাই। (প্রস্থান)

(মন্মথর প্রবেশ)

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি ক'রে কয়দিন আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিলো। দিদি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন—আমি আগে থাকৃতে ব'লে রাখ্‌লেম্, তুমি আবার শুনলে রাগ ক'র্‌বে। (প্রস্থান)

মন্মথ। আগে থাকৃতে ব'লে রাখ্‌লেও রাগ ক'র্‌বো। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক! নিয়ে তো গেলাম, শেষকালে বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি ক'র্‌বে কে?

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে!

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও ক'র্‌তে হয়—সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়!

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হ'লে আমি নিঃশব্দে সহ্য ক'র্‌তেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি ক'র্‌তে পারি না। যে ছেলে চাবা মাত্রই পায় চাবার পূর্ব্বেই যার অভাব মোচন হ'তে থাকে সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন ক'র্‌তে না শিখে কোনো কালে সুখী হ'তে পারে না। বঞ্চিত হ'য়ে ধৈর্য্যরক্ষা ক'র্‌বার যে বিদ্যা আমি তাই ছেলেকে দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির চেন জোগাতে চাইনে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তখনি ধূলিসাৎ হবে না। সকলেরই যদি তোমার মতো সদ্বুদ্ধি থাকতো তা হ'লে তো কথাই ছিলো না; তা যখন নেই তখন সাধুসঙ্কল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, ধৈর্য্য চাই। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে উল্টামুখে চ'ল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লে অনেক বিপদে প'ড়বে—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধামত ফল পাওয়া যায়! বাতাস যখন উল্টা বয় জাহাজের পাল তখন আড় ক'রে রাখ্‌তে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়া যাও! ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যার ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশঘণ্টা বাস ক'র্‌তে হয় তাঁকে ভয় না ক'র্‌বো তো কা'কে ক'র্‌বো? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব ক'রে লাভ কি? আঘাত ক'র্‌লেও কষ্টো, আঘাত পেলেও কষ্টো। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাট্য ব'লে স্বীকার ক'রে কাজের বেলায় নিজের মতে চালানোই সৎপরামর্শ—গোঁয়ার্তুমি ক'র্‌তে গেলেই মুস্কিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি সুদীর্ঘ হ'তো তবে ধীরে সুস্থে তোমার মতে চলা যেতো পরমায়ু যে অল্পো।

শশধর। সেই জন্যই তো ভাই বিবেচনা ক'রে চ'ল্‌তে হয়। সাম্‌নে একটা পাথর প'ড়্‌লে যে লোক ঘুরে না গিয়া সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ ক'র্‌তে চায়

বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ-সকল বলা বৃথা—প্রতিদিনই তো ঠেকছো তবু যখন শিক্ষা পাচ্ছো না তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এম্নি ভাবে চ'ল্‌তে চাও যেনো তোমার স্ত্রী ব'লে একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই—অথচ তিনি যে আছেন সে-সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাক্‌বার কোনো কারণ দেখি নে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—শাস্ত্রে এইরূপ লেখে। কিন্তু দম্পতিবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করে না।

মন্মথবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ—তবু তাহার আরম্ভও বহু নহে তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে—ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাবু কহিলেন—"তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোষাক পরাতে আরম্ভ ক'রেছো সে আমার পছন্দ নয়।"

বিধু কহিলেন—"পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে! আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে!"

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন—"সকলের মতেই যদি চ'ল্‌বে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করিলে কেনো।"

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চ'ল্‌বে তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ ক'র্‌বার কি দরকার ছিলো?

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক। তোমার ছেলেটিকে সাহেব ক'রে তুলো না!

বিধু। কেনো ক'র্‌বো না! তাকে কি চাসা ক'র্‌বো!

এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্বামী-স্ত্রীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেলো।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ওকি ও, তোমার ছেলেটিকে কি মাখিয়েছো?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি!

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার ব'লেছি ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত সৌখীন জিনিষ অভ্যাস করাতে পার্‌বে না।

বিধু। আচ্ছা যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হ'তে কেরোসিন এবং কাষ্টর্ অয়েল্ মাখাবো।

মন্মথ। সে-ও বাজে খরচ হবে। যেটা না হ'লেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো। কেরোসিন কাষ্টর্ অয়েল্ গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিষ ক'টা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে ব'স্‌তে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে! এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ-বয়সে হয় তো সহ্য হবে না! যাই হোক্ এ-কথা আমি তোমাকে আগে হ'তে ব'লে রাখ্‌ছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব ক'রো বা নবাব ক'রো বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও তা'র খরচ আমি জোগাবো না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার সখের খরচ কুলোবে না।

বিধু। সে আমি জানি! তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখ্‌লে ছেলেকে কপনি পরানো অভ্যাস করাতেম!

বিধুর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাইয়া

লইলেন, কহিলেন, "আমিও তা জানি! তোমার ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা! তার সন্তান নেই ব'লে ঠিক ক'রে ব'সে আছো তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে প'ড়ে দিয়ে যাবে। সেই জন্যই যখন তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করিতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগযাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।"

এ-কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে—কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কখনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন, স্বামী তাহার গূঢ় অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পাবেন নাই, কারণ স্বামি-সম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ। কিন্তু মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন—"ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সহে না, এতো বড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারিনি।"

এমন সময় বিধবা জা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মেজ বৌ তোদের ধন্য! আজ সতেরো বৎসর হ'য়ে গেলো তবু তোদের কথা ফুরালো না! রাত্রে কুলায় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এতো মধু দিন রাত্রি জোগান কোথা হ'তে আমি তাই ভাবি! রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত ক'র্‌বো না, একবার কেবল দু'মিনিটের জন্য মেজ বৌয়ের কাছ হ'তে শেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি!"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাই মা!

জেঠাই মা। কি বাপ!

সতীশ। আজ ভাহুড়ি-সাহেবের ছেলেকে মা-চা খাওয়াবেন, তুমি যেনো সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না!

জেঠাই মা। আমার যাবার দরকার কি সতীশ!

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চ'ল্‌বে না, তোমাকে—

জেঠাই মা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই আমি এই ঘরেই থাক্‌বো, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয় আমি বা'র হব না।

সতীশ। জেঠাই মা, আমি মনে ক'র্‌ছি তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত ক'র্‌বো। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক— চা খাবার ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই! মার শোবার ঘরে সিন্দুক ফিন্দুক কতো কি রয়েছে, সেখানে কা'কেও নিয়ে যেতে লজ্জা ক'র্‌বে।

জেঠাই মা। আমার এখানেও তো জিনিষ পত্র—

সতীশ। ওগুলো আজকের মতো বার ক'রে দিতে হবে। বিশেষতঃ তোমার এই বঁটি চুপ্‌ড়ি বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখ্‌লে চ'ল্‌বে না।

জেঠাই মা। কেনো বাবা, ও গুলোতে এতো লজ্জা কিসের? তাদের বাড়িতে কি কুট্‌নো কুট্‌বার নিয়ম নাই।

সতীশ। তা জানিনে জেঠাই মা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদুড়ি নিশ্চয় হাস্‌বে, বাড়ি গিয়ে তা'র বোনদের কাছে গল্প ক'র্‌বে।

জেঠাই মা। শোনো একবার ছেলের কথা শোনো! বঁটি চুপ্‌ড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে গল্প ক'র্‌তে তো শুনি নি!

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ ক'র্‌তে হবে জেঠাই মা—আমাদের নন্দকে তুমি যেমন ক'রে পারো এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি-গায়ে ফস্‌ ক'রে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাই মা। তাকে যেনো ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালিগায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধ'রেছিলেম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না!

জেঠাই মা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস্‌, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো ক'রে সাফ করিয়ে দেবো এখন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এমন ক'রে তো চলে না!

বিধু। কেনো কি হয়েছে?

সতীশ। চাঁদনীর কোর্ট ট্রাউজার প'রে আমার বা'র হ'তে লজ্জা ক'রে। সেদিন ভাদুড়ি সাহেবের বাড়ি ইভনিংপার্টি ছিলো, কয়েকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেসসুট প'রে গিয়েছিলো, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে প'ড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জানো তো সতীশ, তিনি যা ধ'রেন তা কিছুতেই ছাড়েন না! কতো টাকা হ'লে তোমার মনের মতো পোষাক হয় শুনি!

সতীশ। একটা মর্ণিংসুট আর একটা লাউঞ্জসুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগ্‌বে। একটা চলনসই ইভনিংড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না!

বিধু। বলো কি সতীশ! এ তো তিনশো টাকার ধাক্কা, এতো টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি ক'র্‌তে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশ্‌তে হয় তবে অমন টানাটানি ক'রে চলে না। ভদ্রতা রাখ্‌তে গেলে তো খরচ ক'র্‌তে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও না কেনো, সেখানে ড্রেস কোর্টের দরকার হবে না।

বিধু। তা তো জানি, কিন্তু—আচ্ছা তোমার মেসো তো তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোষাক তাঁর কাছ হ'তে জোগাড় ক'রে নাও না। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হ'তে কাপড় আদায় ক'রেছি তা হ'লে রক্ষা থাক্‌বে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সাম্‌লাতে পার্‌বো। (সতীশের প্রস্থান) ভাদুড়ি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোনো মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা

হ'লেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি। ভাতুড়ি সাহেব ব্যারিষ্টার মানুষ, বেশ দু'দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হ'তেই সতীশ তো ওদের বাড়ি অনাগোনা করে মেয়েটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ ক'র্‌বে! সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবাব চিন্তাও করেন না, ব'ল্‌তে গেলে আগুন হ'য়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাব্‌তে হয়।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিষ্টার ভাতুড়িব বাড়িতে টেনিস্‌ক্ষেত্র।

নলিনী। ও কি সতীশ পালাও কোথায়?

সতীশ তোমাদের এখানে টেনিস্‌পার্টি জান্‌তেম না, আমি টেনিস্‌সুট প'রে আসিনি

নলিনী। সকল গরুর তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল ব'লেই নাম র'টবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা ক'রে দিচ্ছি। মিষ্টার নন্দী আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেনো হুকুম বলুন না—আমি আপনারি সেবার্থে!

নলিনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ ক'র্‌বেন—ইনি আজ টেনিস্‌সুট প'রে আসেন নি। এতো বড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি ক'র্‌লে খুন, জাল, ঘর জ্বালানও মাপ ক'র্‌তে পারি। টেনিস্‌সুট না প'রে এলে যদি আপনার এতো দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস্‌সুটটা মিষ্টার সতীশকে দান ক'রে তাঁর এই—এটাকে কি বলি! তোমার এটা কি সুট সতীশ?—খিচুড়ী সুটই বলা যাক্—তা আমি সতীশের এই খিচুড়ী সুটটা প'রে রোজ এখানে আস্‌বো। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য্য-চন্দ্রতারা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা ক'র্‌বো না। সতীশ এ কাপড়টা দান ক'র্‌তে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দর্জ্জির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে ভাতুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান্।

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিষ্টার নন্দীর কাছে শিখ্‌তে পারো। এমন আদর্শ আর পাবে না! বিলাতে ইনি ডিউক্‌ ডাচেস্‌ ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও ক'ন নাই। মিষ্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিলো?

নন্দী। আমি বাঙালীদের সঙ্গে সেখানে মিশিনি।

নলিনী। শুন্‌চো সতীশ! রীতিমতো সভ্য হ'তে গেলে কতো সাবধানে থাক্‌তে হয়! তুমি বোধ হয় চেষ্টা ক'র্‌লে পার্‌বে। টেনিস্‌সুট সম্বন্ধে তোমার যে রকম সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান তাতে আশা হয়। (অন্যত্র গমন)

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্য্যন্ত বুঝতেই পার্‌লেম না। আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মুস্কিল হ'য়েছে, আমি কিছুতে এখানে এসে সুস্থ মনে থাক্‌তে পারি নে—কেবলি মনে হয় আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাছটায় হয় তো কুঁচ্‌কে আছে। নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ঐ রকম অনায়াসে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনবার আসিয়া) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনের খেদ মিটলো না! টেনিস্‌ কোর্ত্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেলো! হায়, কোর্ত্তাহারা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দর্জ্জির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখ্‌তে তবে এমন কথা আর ব'ল্‌তে না নেলি!

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা! মিষ্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনি সুরু হ'য়েছে! প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উন্নতি হবে ভরসা হ'চ্ছে! এসো একটু কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না আজ আর খাবো না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো,—টেনিস্‌ কোর্ত্তার খেদে শরীর নষ্টো কোরো না, খাওয়া দাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্ত্তা জিনিষটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হ'লে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না!

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া ব্যবহার আরম্ভ ক'রেছ, এখন ওর প্রতি অতোটা শাসন ভালো নয়!

বিধু। বলো তো রায় মশায়! আমি তো ওঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে পার্‌লেম না!

মন্মথ। ছুটো অপবাদ এক মুহূর্ত্তেই! একজন ব'ল্লেন নির্দ্দয়, আর একজন ব'ল্লেন নির্ব্বোধ! যাঁর কাছে হতবুদ্ধি হ'য়ে আছি তিনি যা ব'লেন সহ্য ক'র্‌তে রাজি আছি—তাঁর ভগ্নী যাহা ব'ল্‌বেন তার উপরেও কথা কবো না, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর ভগ্নীপতি পর্য্যন্তো সহিষ্ণুতা চ'লবে না। আমার ব্যবহারটা কি রকম কড়া শুনি!

শশধর। বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের সখ আছে ও পাঁচ জায়গায় মিশ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, ওকে তুমি চাঁদনীর—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনীর কাপড় প'র্‌তে বলিনে। ফিরিঙ্গি পোষাক আমার ছু-চক্ষের বিষ। ধুতি চাদর চাপ্‌কান চোগা পরুক, কখনো লজ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশ যদি এ-বয়সে সখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়ো বয়সে খাম্‌কা কি ক'রে ব'স্‌বে সে আরো বদ্ দেখ্‌তে হবে। আর ভেবে দেখো যেটাকে আমরা শিশুকাল হ'তেই সভ্যতা ব'লে শিখ্‌চি তার আক্রমণ ঠেকাবে কি ক'রে?

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমস্‌লা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে-দিক হ'তে তোমার সভ্যতা আস্‌ছে টাকাটা সে-দিক হ'তে আস্‌ছে না, বরং এখান হ'তে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধু। রায় মশায়, পেরে উঠ্‌বেন না—দেশের কথা উঠে প'ড়্‌লে ওকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আমিও বুঝি। কিন্তু ছেলেদের আবদারও তো এড়াতে পারিনে। সতীশ, ভাছড়ি-সাহেবদের সঙ্গে যখন মেশামেশি

ক'র্‌চে তখন উপযুক্ত কাপড় না থাক্‌লে ও বেচারার বড়ো মুস্কিল। আমি র‍্যাঙ্কিনের বাড়িতে ওর জন্য—

( ভৃত্যের প্রবেশ )

ভৃত্য। সাহেব-বাড়ি হ'তে এই কাপড় এসেছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা! এখনি নিয়ে যা! ( বিধুর প্রতি ) দেখো সতীশকে যদি আমি এ কাপড় প'র্‌তে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাক্‌তে দেবো না, মেসে পাঠিয়ে দেবো সেখানে সে আপন ইচ্ছামত চ'ল্‌তে পার্‌বে! ( দ্রুত প্রস্থান )

শশধর। অবাক্ কাণ্ড!

বিধু। ( সরোদনে ) রায় মশায়, তোমাকে কি ব'ল্‌বো, আমার বেঁচে সুখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেচে!

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও তো ঠিক ভালো হ'লো না। বোধ হয় মন্মথর হজমের গোল হ'য়েচে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডাল ভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক না কেনো, মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রান্না না হ'লে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভালো ক'রে খাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি যা ব'ল্‌বে ও তাই শুন্‌বে। এ-সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন! ( প্রস্থান, বিধুর ক্রন্দন )

বিধবা জা। ( ঘরে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত ) কখনো কান্না কখনো হাসি—কত রকম যে সোহাগ তা'র ঠিক নেই—বেশ আছে ( দীর্ঘ নিশ্বাস )। ও মেজ বৌ, গোসাঘরে ব'সেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হ'য়ে যাক!

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেনো ডেকে পাঠিয়েচি বলি, রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেচো ব'লে রাগ ক'র্‌বো আমার মেজাজ কি এতই বদ্‌?

নলিনী। না ও-সব কথা থাক! সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি কোরো না! বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেনো দিলে?

সতীশ। যাঁকে দিয়েচি তাঁর তুলনায় জিনিষটার দাম এমনই কি বেশি!

নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল!

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি! তার প্রতি যখন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষপাত—

নলিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কবো না।

সতীশ। আচ্ছা মাপ করো, আমি চুপ ক'রে শুন্‌বো।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিষ্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্ব্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তা'র চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস্‌ পাঠাতে গেলে কেনো?

সতীশ। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই ব'লে তুমি রাগ ক'র্‌চো নেলি!

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও নেক্‌লেস্‌ তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেবো। বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে দান, আমার কাছে সে দানের কোনো মূল্য নেই!

সতীশ। তুমি অন্যায় ব'ল্‌চো নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় ব'ল্‌চিনে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুসি হ'তেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে

আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ ক'রেচো। পাছে তোমার মনে লাগে ব'লে আমি এতোদিন কিছু বলিনি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চ'লেছে. আর আমার চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস্।

সতীশ। এ নেক্‌লেস্ তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেবো না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হ'তেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়োনা। সত্য ক'রে ব'লো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি?

সতীশ। কে তোমাকে ব'লেচে? নরেন বুঝি?

নলিনী। কেউ ব'লে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেনো ক'র্‌চো?

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্ততো ধার ক'র্‌বার দুঃখটুকু স্বীকার ক'র্‌বার যে সুখ তাও কি ভোগ ক'র্‌তে দেবে না? আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই ক'র্‌তে চাই নেলি, একেও যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল বলো তবে আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা তোমার যা ক'র্‌বার তা তো ক'রেচো—তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিষটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেক্‌লেস্‌টা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ ক'রে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ ক'র্‌বে কি ক'রে?

সতীশ। মার কাছ হ'তে টাকা পাবো।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে ক'র্‌বেন আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হ'চ্চে।

সতীশ। সে-কথা তিনি কখনই মনে ক'র্‌বেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি অনেক দিন হ'তে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রো এখন হ'তে তুমি আমাকে দামি জিনিষ দেবে না। বড়ো জোব ফুলের তোড়ার বেশী আর কিছু দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা সেই প্রতিজ্ঞাই ক'রলেম।

নলিনী। যাক্‌, এখন তবে তোমার গুরু নন্দী সাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো! দেখি স্তুতিবাদ ক'র্‌বার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হ'লো। আচ্ছা আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কি ব'ল্‌তে পারো বলো—আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা ব'ল্‌বো তাতে ঐ ডগাটুকু লাল হ'য়ে উঠ্‌বে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয়নি। আজকের মতো ঐটুকুই থাক্‌, বাকিটুকু আর একদিন হবে। এখনি কান ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌তে সুরু হ'য়েছে

## নবম পরিচ্ছেদ

বিধু। আমার উপর রাগ করো যা করো ছেলের উপর কোরো না। তোমার পায়ে ধরি এবারকার মতো তার দেনাটা শোধ ক'রে দাও!

মন্মথ। আমি রাগারাগি ক'র্‌চিনে, আমার যা কর্ত্তব্য তা আমাকে ক'র্‌তেই হবে! আমি সতীশকে বার বার ব'লেচি দেনা ক'র্‌লে শোধবার ভার আমি নেবো না। আমার সে কথার অন্যথা হবে না।

বিধু। ওগো এতো বড়ো সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হ'লে সংসারে চ'লে না। সতীশের এখন বয়স হ'য়েচে, তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না ক'রে তাহার চলে কি ক'রে বলো দেখি!

মন্মথ। যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো ক'র্‌লে কারোই চ'লে না, ফকিরেরও না বাদসারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে?

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখ্‌বো কি ক'রে? (প্রস্থান)

শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখ্‌লে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে, কালো কোর্ত্তা ফর্‌মাস দেবার জন্য ফিতা হাতে তা'র ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেচি। তাই ক'দিন আসিনি, আজ তোমার চিঠি পেয়ে সুকু কান্নাকাটি ক'রে আমাকে বাড়িছাড়া ক'রেচে।

বিধু। দিদি আসেন নি?

শশধর। তিনি এখনি আস্‌বেন। ব্যাপারটা কি?

বিধু। সবই তো শুনেচো। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন সুস্থির হ'চ্ছে না। র‍্যাঙ্কিন হার্ম্মানের পোষাক তাঁর পছন্দ হ'লো না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সুসভ্য।

শশধর। আর যাই বলো, মন্মথকে বোঝাতে যেতে আমি পার্‌বো না। তার কথা আমি বুঝি নে আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধু। সে কি আমি জানি নে? তোমরা তো তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট ক'রে সমস্তই সহ্য ক'র্‌বে! কিন্তু এখন এ বিপদ ঠেকাই কি ক'রে?

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি—

বিধু। কিছুই নেই—সতীশের ধার শুধ্‌তে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা প'ড়েছে, হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা ক'রে করো না, এখন কি মুস্কিলে প'ড়েচো দেখ দেখি!

সতীশ। মুস্কিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাঁস করো নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কতো?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিস্, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস্‌নে।

শশধর। ছি ছি সতীশ। এমন কথা যদিবা কখনো মনেও আসে তবু কি মার সাম্‌নে উচ্চারণ করা যায়? বড় অন্যায় কথা।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্ দিন কি ক'রে ব'সে আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা ব'লে শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কি ব'লে!

বিধু। ব'লে কিনা আফিম কিনে আন্‌বে!

সুকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! সতীশ আমার গা ছুঁয়ে বল্ এমন কথা মনেও আন্‌বি নে! চুপ্ ক'রে রইলি যে! লক্ষ্মী বাপ আমার! তোর মা মাসির কথা মনে করিস্।

সতীশ। জেলে ব'সে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো!

সুকুমারী। আমরা থাক্‌তে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা সে দেখ্‌বো কতো বড় পেয়াদা; ও গো এই টাকাটা ফেলে দাও না, ছেলেমানুষকে কেনো কষ্ট দেওয়া!

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইট ফেলে না মারে!

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে প'ড়্‌বে। একে একজামিনে ফেল ক'রেছি; তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এতো বড়ো সুযোগটা যদি মাটি হ'য়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ ক'র্‌বেন না।

বিধু। সত্যি দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েচে শুন্‌লে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হ'তে বা'র ক'রে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন না! আর কি কোথাও বাড়ি নাই না কি! ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না! আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমি না হয় ওকেই মানুষ করি! কি ব'লোগো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টান্‌তে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে!

সুকুমারী। বাঘ মশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা ব'ল্‌তে পার্‌বেন না।

শশধর। বাঘিনী কি ব'লেন, বাচ্ছাই বা কি ব'লে!

সুকুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে-কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না! তুমি এখন দেনাটা শোধ ক'রে দাও!

বিধু। দিদি!

সুকুমারী। আর দিদি দিদি ক'রে কাঁদ্‌তে হবে না! চল্‌ তোর চুল বেঁধে দিই গে! এমন ছিরি ক'রে তোর ভগ্নীপতির সাম্‌নে বা'র হ'তে লজ্জা করে না।

(শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মন্মথর প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই তুমি একটু বিবেচনা ক'রে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না ক'রে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো ক'রো! ছেলেটাকে কি জেলে দেবে? তাতে কি ওর ভালো হবে?

মন্মথ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্য্যন্ত ভেবে উঠ্‌তে পারে না। আমি মোটামুটি এই বুঝি যে, বার-বার সাবধান ক'রে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হ'তে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারো উচিত হয় না। আমরা যদি মাঝে প'ড়ে ব্যর্থ ক'রে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌তো।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হ'তো তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্নেহটুকু দিতেন না। মন্মথ তুমি যে দিনরাত কর্ম্মফল কর্ম্মফল ক'রো আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হ'তে কর্ম্মফল কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্ত্তা আছেন তিনি

মাঝে প'ড়ে তার অনেকটাই মহকুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্ম্মফলের দেনা শুধ্‌তে শুধ্‌তে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিকিয়ে যেতো। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্ম্মফল সত্য কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্য রকম। কর্ম্মফল নৈসর্গিক—মার্জ্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈসর্গিক মানুষ তিনি যা খুসি ক'র্‌বেন, আমি অতি সামান্য নৈসর্গিক, আমি কর্ম্মফল শেষ পর্য্যন্তই মানি!

শশধর। আচ্ছা আমি যদি সতীশের দেনা শোধ ক'রে তাকে খালাস করি, তুমি কি ক'র্‌বে?

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ ক'র্‌বো। দেখো সতীশকে আমি যে-ভাবে মানুষ ক'র্‌তে চেয়েছিলেম প্রথম হ'তেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ ক'রেচো। একদিক হ'তে সংযম আর একদিক হ'তে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চ'লে যায়, যে কাজের যে পরিণাম তোমরা যদি মাঝে প'ড়ে কিছুতেই তাকে তা বুঝ্‌তে না দাও তবে তার আশা আমি ত্যাগ ক'র্‌লেম। তোমাদের মতেই তাকে মানুষ ক'রো—দুই নৌকায় পা দিয়েই তাহার বিপদ ঘ'টেছে!

শশধর। ও কি কথা ব'ল্‌চো মন্মথ—তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাসমতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ ক'র্‌তে পারি, অন্য কোনো উপায় তো জানি না। যখন নিশ্চয় দেখ্‌ছি তা কোনোমতেই হবার নয়, তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখ্‌বো না। আমার যা সাধ্য তার বেশি আমি ক'র্‌তে পার্‌বো না!

(মন্মথর প্রস্থান)

শশধর। কি করা যায়! ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না? অপরাধ মানুষের পক্ষে যত সর্ব্বনেশেই হোক্ জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

## দশম পরিচ্ছেদ

ভাহুড়িজায়া। শুনেচো, সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে।

মিষ্টার ভাহুড়ি। হাঁ, সে তো শুনেছি!

জায়া। সে যে সমস্ত সম্পত্তি হাঁসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মা'র জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৭৫৲ টাকা মাসহারা বরাদ্দ ক'রে গেছে। এখন কি করা যায়!

ভাহুড়ি। এতো ভাবনা কেনো তোমার?

জায়া। বেশ লোক যা হোক্ তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেয়ে দেখ্‌তে পাওনা! তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কি ক'র্‌বে?

ভাহুড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করিনি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর ক'রে ব'সেছিলে? অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

ভাহুড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক, যিনি যাই বলুন ওর চেয়ে আবশ্যক আর কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জানো।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষুধা-শান্তি হয় না।

ভাহুড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল—অগাধ টাকা—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্‌পট্‌ নিক্ না। তুমি একটু তাড়া দাও না।

ভাহুড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিক্‌ঠাক্‌, এখন কেবল একটা আইনের খট্‌কা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হ'য়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও না।

ভাদুড়ি। ব্যস্ত হ'য়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে! আমি ভাব্‌ছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি ক'রে। আবার আমাদের নেলি যে রকম জেদালো মেয়ে সে যে কি ক'রে ব'স্‌তো বলা যায় না। কিন্তু তাই ব'লে গরীবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে ব'সেছিলো এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর পেলো অমনি তখনি উঠে চ'লে গেলো।

ভাদুড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরো মনে ক'র্‌তাম নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো না বিড়াল ছানাটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়্‌তে চায় না.

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এখানে আমি যে কতো সুখে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝ্‌তে পারো। কিন্তু মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছিনে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায্য হবে না। অনেক দিন হ'তে নেবে নেবে ক'রেও আমাকে পোষ্যপুত্র নিচ্চেন না—বোধ হয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাশভাবে) সে আশা সফল হয় বা সতীশ!

সতীশ। অ্যাঁ! বল কি মা!

বিধু। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেক সময় ভুলও তো হয়!

বিধু। না ভুল নয় সতীশ, এবার তোর ভাই হবে!

সতীশ। কি যে ব'লো মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বল্লে! বোন্ হ'তে পারে না বুঝি!

বিধু। দিদির চেহারা যে রকম হ'য়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক্ মেয়েই হোক্ আমাদের পক্ষে সমানই!

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘট্তে পারে!

বিধু। সতীশ তুই চাক্‌রির চেষ্টা ক'র্!

সতীশ। অসম্ভব! পাস ক'র্‌তে পারিনি। তা ছাড়া চাকুরি ক'র্‌বার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু যাই ব'লো মা, এ ভারি অন্যায়! আমি তো এতোদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তা'র থেকে বঞ্চিত হ'লেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অন্যায় নয় তো কি সতীশ! এদিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ওদিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধও খাওয়া চ'লে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কি রকম ব্যবহার! শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খেটে গেলো! অস্থির হোস্‌নে সতীশ! একমনে ভগবান্‌কে ডাক্—তাঁর কাছে কোনো ডাক্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা তিনি যদি এখনো—! এখনো সময় আছে! মা এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু যে রকম অন্যায় হ'লো সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হ'য়ে উঠেছে! ঈশ্বরের কাছে এঁদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা ক'রে থাক্‌তে পার্‌চিনে—তিনি দয়া ক'রে যেন—

বিধু। আহা তাই হোক্, নইলে তোর উপায় কি হবে সতীশ, আমি তাই ভাবি। হে ভগবান্ তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মান্‌বো না! কাগজে নাস্তিকতা প্রচার ক'র্‌বো!

বিধু। আরে চুপ্, চুপ্, এখন অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই! তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হ'লে কি না ঘ'ট্‌তে পারে। সতীশ, তুই আজ এতো

ফিট্-ফাট্ সাজ ক'রে কোথায় চ'লেছিস্? উঁচু কলার প'রে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেক্‌লো! ঘাড় হেঁট্ ক'র্‌বি কি ক'রে?

সতীশ। এম্‌নি ক'রে কলারের জোরে যতোদিন মাথা তুলে চ'ল্‌তে পারি চ'ল্‌বো, তার পরে ঘাড় হেঁট্ ক'র্‌বার দিন যখন আস্‌বে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চ'ল্‌বে। বিশেষ কাজ আছে মা, চ'ল্লেম, কথাবার্ত্তা পরে হবে।

(প্রস্থান)

বিধু। কাজ কোথায় আছে তা জানি! মাগো, ছেলের আর তর্ সয় না! এ বিবাহটা ঘ'ট্‌বেই! আমি জানি আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়, প্রথমে বিঘ্ন যতোই ঘটুক্ শেষকালটায় ওর্ ভালো হয়ই এ আমি বরাবর দেখে আস্‌চি! না হবেই বা কেন! আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করিনি— আমি তো সতী স্ত্রী ছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হ'চ্চে দিদির এবারে—!

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কি মাসিমা!

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আন্‌বার জন্য এতো ক'রে ব'ল্লেম অপমান বোধ হ'লো বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের মাসিমা! কাল ভাদুড়ি সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিলো তাই——

সুকুমারী। ভাদুড়ি সাহেবের ওখানে তোমার এতো ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি তা তো ভেবে পাইনে। তা'রা সাহেব মানুষ তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে? আমি তো শুন্‌লেম তোমাকে তা'রা আজকাল পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙীন টাইয়ের উপর টাইরিং প'রে বিলাতি কার্ত্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা ক'র্‌তেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই! তাই যদি থাক্‌বে তবে কি কাজকর্ম্মের কোনো চেষ্টা না ক'রে এখানে এমন ক'রে প'ড়ে থাক্‌তে? তার উপরে আবার একটা কাজ ক'র্‌তে ব'ল্‌লে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে

ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভুল করে! কিন্তু সরকারও তো ভালো—সে খেটে উপার্জ্জন ক'রে খায়!

সতীশ। মাসিমা আমিও হয় তো পার্‌তেম, কিন্তু তুমিই তো——

সুকুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারি দোষ হবে! এখন বুঝ্‌চি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিন্‌তেন! আমি আরো ছেলেমানুষ ব'লে দয়া ক'রে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেলে থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারি যতো দোষ হ'লো। একেই ব'লে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা আমারই না হয় দোষ হ'লো, তবু যে ক'দিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্চো দরকার মতো দুটো কাজই না হয় ক'রে দিলে। এমন কি কেউ ক'রে না! এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কি ক'র্‌তে হবে ব'লো, আমি এখনি ক'র্‌চি।

সুকুমারী। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক্ চাই—আর একটা সেলার সুট্—(সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোনো শোনো ওর মাপ্‌টা নিয়ে যেয়ো, জুতো চাই! (সতীশ প্রস্থানোন্মুখ) অতো ব্যস্ত হ'চ্চো কেন—সবগুলো ভালো ক'রে শুনেই যাও! আজও বুঝি ভাদুড়ি সাহেবের রুটি বিস্কিট্ খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ ক'র্‌চে! খোকার জন্য ষ্ট্র-হ্যাট্ এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই! (সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া) শোনো সতীশ, আর একটা কথা আছে! শুন্‌লাম তোমার মেসোর কাছ হ'তে তুমি নূতন সুট্ কেন্‌বার জন্য আমাকে না ব'লে টাকা চেয়ে নিয়েচো। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যতো খুসি সাহেবিয়ানা ক'রো, কিন্তু পরের পয়সায় ভাদুড়ি সাহেবদের তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর ক'রে দিয়ো না! সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো! আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়!

সতীশ। আচ্ছা এনে দিচ্চি।

সুকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখ্‌তে ভুলো না যেন (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোনো সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিন্‌তে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে ব'সো না! ঐজন্যে তোমাকে কিছু আন্‌তে ব'ল্‌তে ভয় করে! দু'পা

হেঁটে চ'ল্‌তে হ'লেই অম্‌নি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা প'ড়ে—পুরুষ মানুষ এতো বাবু হ'লে তো চ'লে না! তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হ'তে মাছ কিনে আন্‌তেন—মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নাই!

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাক্‌বে—আমিও দে'বো না! আজ হ'তে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যতো অল্প লাগে সেদিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাক্‌বে!

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধ'রে ও কি লিখ্‌চো, কা'কে লিখ্‌চো বলো না!

সতীশ। যা, যা, তোর সে খবরে কাজ কি, তুই খেলা ক'র্‌গে যা!

হরেন। দেখি না কি লিখ্‌চো—আমি আজকাল প'ড়্‌তে পারি!

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস্‌ নে ব'ল্‌চি—যা তুই!

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা। দাদা কি ভালবাসার কথা লিখ্‌চো ব'লো না! তুমিও কাঁচা পেয়ারা ভালোবাসো বুঝি! আমিও বাসি!

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস্‌নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখিনি।

হরেন। অ্যাঁ! মিথ্যা কথা ব'ল্‌চো! আমি যে প'ড়লেম ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালবাসা। আচ্ছা মাকে ডাকি তাঁকে দেখাও!

সতীশ। না, না, মাকে ডাক্‌তে হবে না! লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা ক'র্‌তে যা, আমি এইটে শেষ করি!

হরেন। এটা কি দাদা! এযে ফুলের তোড়া! আমি নেবো!

সতীশ। ওতে হাত দিস্‌নে, হাত দিস্‌নে ছিঁড়ে ফেল্‌বি!

হরেন। না আমি ছিঁড়ে ফেল্‌বো না, আমাকে দাও না!

সতীশ। খোকা কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেবো, এটা থাক্‌!

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেবো!

সতীশ। না, এ আর একজনের জিনিষ, আমি তোকে দিতে পার্‌বো না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্চুস্‌ আন্‌তে ব’লেছিলেম তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেচো--তাই বই কি, আরেকজনের জিনিষ বই কি!

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ্‌ কর, চিঠিখানা শেষ ক’রে ফেলি! কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্চুস্‌ কিনে এনে দে’বো!

হরেন। আচ্ছা তুমি কি লিখ্‌চো আমাকে দেখাও!

সতীশ। আচ্ছা দেখাবো, আগে লেখাটা শেষ করি!

হরেন। তবে আমিও লিখি! (শ্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে) ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা সয়ে আকার সা ভালবাসা।

সতীশ। চুপ্‌ চুপ্‌, অতো চীৎকার করিস্‌নে!——
আঃ, থাম্‌ থাম্‌!

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও!

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস্‌নে!—ও কি কর্‌লি! যা বারণ ক’র্‌লেম তাই! ফুলটা ছিঁড়ে ফেল্লি! এমন বদ্‌ছেলেও তো দেখিনি! (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা ব’ল্‌চি! যা!

(হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, সতীশের সবেগে প্রস্থান,

বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ)।

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েচে, দিদি টের পেলে সর্ব্বনাশ হবে! হরেন, বাপ আমার কাঁদিস্‌নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। আচ্ছা আচ্ছা চুপ্‌ কর, চুপ্‌ কর! আমি দাদাকে খুব ক’রে মার্‌বো এখন!

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেলো!

বিধু। আচ্ছা সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আস্‌চি! (হরেনের

ক্রন্দন ) এমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্চেন। যখন যেটি চায় তখনি সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো না, একবারে নবাব-পুত্র! ছি ছি নিজের ছেলেকে কি এমন ক'রেই মাটি ক'র্‌তে হয়! ( সতর্জ্জনে ) খোকা, চুপ্‌ কর ব'ল্‌চি! ঐ হাম্‌দোবুড়ো আস্‌চে!

( সুকুমারীর প্রবেশ )

সুকুমারী। বিধু, ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি ক'রেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়! আমি চাকরবাকরদের বারণ ক'রে দিয়েচি কেউ ওর কাছে ভূতের কথা ব'ল্‌তে সাহস করে না!—আর তুমি বুঝি মাসি হ'য়ে ওর এই উপকার ক'র্‌তে ব'সেচো! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপরাধ ক'রেচে! ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখ্‌তে পারো না, তা আমি বেশ বুঝেচি! আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ ক'র্‌লেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেচো!

বিধু। ( সরোদনে ) দিদি এমন কথা ব'লো না! আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনের প্রভেদ কি আছে?

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা ব'ল্‌তে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলোই না তা মার্‌বে কি ক'রে।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে ব'সে চিঠি লিখ্‌ছিলো—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার, ভালবাসা! মা, তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জুস্‌ আন্‌তে ব'লেছিলে, দাদা সেই টাকায় ফুলের তোড়া কিনে এনেছে—তাতেই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম ব'লেই অম্‌নি আমাকে মেরেচে!

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচো বুঝি! ওকে তোমাদের সহ্য হ'চ্চে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচো! আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার ক'ব্‌রাজের বোতল বোতল ওষুধ গিল্‌চে তবু দিন দিন এমন রোগা হ'চ্চে কেন! ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেলো।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি নেলি!

নলিনী। কেনো, কোথায় যাবে!

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। সে জাগায় যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়? যে লোক সন্ধান জানে সে তো ঘরে ব'সেই সেখানে যেতে পারে! আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন? কলারটা বুঝি ঠিক হালফেশানের হয়নি!

সতীশ। তুমি কি মনে করো আমি কেবল কলারের কথাই দিন-রাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাইতো মনে হয়! সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়!

সতীশ। ঠাট্টা ক'রো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখ্‌তে পেতে—

নলিনী। তা হ'লে ডুমুরের ফুল এবং সাঁপের পাঁচ পাও দেখ্‌তে পেতাম!

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর! সত্যই ব'ল্‌চি নেলি আজ বিদায় নিতে এসেচি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি ক'র্‌চি নেলি ঠাট্টা ক'রে আমাকে দগ্ধ ক'রো না! আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেবো!

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এতো বেশি আগ্রহ কেন?

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কতো দরিদ্র তা তুমি জানো না!

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের! আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাইনি!

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হ'য়েছিলো—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হ'তেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জান্‌তে পেরে মিষ্টার ভাদুড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন!

নলিনী। অম্‌নি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হ'য়ে যেতে হবে! এতো বড়ো অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুন্‌লেই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দি!

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখ্‌তে বলো!

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে ব'লো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখ্‌তে ব'ল্‌বো কেন? আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না!

সতীশ। সে তো ঠিক কথা! আমি জান্‌তে চাই তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা ক'রো কি না!

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকৃতে চেষ্টা করে!

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরীবের ঘরের লক্ষ্মী হ'তে পার্‌বে?

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন ক'রে চেপে ধ'র্‌লে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে না! স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুল্‌তেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিন্‌তে পার্‌লেম না নেলি!

নলিনী। চিন্‌বে কেমন ক'রে? আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই কলার নই—দিন রাত যা নিয়ে ভাবো তাই তুমি চেনো।

সতীশ। আমি হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌চি নেলি তুমি আজ আমাকে এমন কথা ব'লো না! আমি যে কি নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জানো—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এতো প্রখর তাহা এতোটা নিঃসংশয়ে স্থির ক'রো না। ঐ বাবা আস্‌চেন। আমাকে এখানে দেখ্‌লে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন আমি যাই! (প্রস্থান)

সতীশ। মিষ্টার ভাদুড়ি, আমি বিদায় নিতে এসেচি।

ভাদুড়ি। আচ্ছা তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদুড়ি। কিন্তু সময় তো নেই আমি এখন বেড়াতে বের হবো!

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি?

ভাদুড়ি। তুমি যে পারো তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পার্‌বো না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে ততো অধিক ব্যাকুল হ'য়ে পড়িনি।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশধর। আঃ কি বলো! তুমি কি পাগল হ'য়েচো না কি?

সুকুমারী। আমি পাগল, না, তুমি চোখে দেখ্‌তে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হ'তেই দেখোনি, ও'দের মুখ কেমন: হ'য়ে গেছে! সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝ্‌তে পারো না!

শশধর। আমার অতো ভাব বুঝ্‌বার ক্ষমতা নেই সে-তো তুমি জানোই! মন জিনিষটাকে অদৃশ্য পদার্থ ব'লেই শিশুকাল হ'তে আমার কেমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে! ঘটনা দেখ্‌লে তবু কতকটা বুঝ্‌তে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো ক'রে তোলো! যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য ক'র্‌তে পারো আমি পার্‌বো না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধ'র্‌তে হয়নি!

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার ক'র্‌তে পার্‌বো না। এখন তোমার অভিপ্রায় কি শুনি!

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমিতো বড়ো বড়ো কথা বলো, একবার তুমি ভেবে দেখো না আমরা হরেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, তার মাসি তাকে

অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও তো ভেবে দেখ্‌তে হয়।

শশধর। তুমি যখন অতো বেশি ক'রে ভাব্‌চো তখন তার উপরে আমার আর ভাব্‌বার দরকার কি আছে! এখন কর্ত্তব্য কি বলো?

সুকুমারী। আমি বলি সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখুক্। পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে সে কি ভালো দেখ্‌তে হয়!

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চ'ল্‌বে কি ক'রে?

সুকুমারী। কেন, ওদের বাড়িভাড়া লাগে না, মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কি!

শশধর। সতীশের যেরূপ চাল দাঁড়িয়েচে, পঁচাত্তর টাকা তো সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দিবে! মার গহনাগাঁঠী ছিলো সে তো অনেক দিন হ'লো গেছে, এখন হবিষ্যান্ন বাঁধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না।

সুকুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অতো লম্বা চালেই বা দরকার কি?

শশধর। মন্মথ সেই কথাই ব'ল্‌তো। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ও'কে দোষ দিই কি ক'রে?

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হ'তে পারে! সব দোষ আমারি! তুমি তো আর কারো কোনো দোষ দেখ্‌তে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি বেড়ে যায়!

শশধর। ওগো রাগ করো কেন—আমিও তো দোষী!

সুকুমারী। তা হ'তে পারে। তোমার কথা তুমি জানো। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলিনি যে তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় ব'সে ব'সে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো!

শশধর। না, ঠিক্ ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে! এখন কি ক'র্‌তে হ'বে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ করো তাই ক'রো। কিন্তু আমি ব'ল্‌চি সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি খোকাকে কোনোমতে

বাইরে যেতে দিতে পার্‌বো না। ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছে—কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়েও কখন একলা সতীশের নজরে প'ড়বে, সে কথা মনে ক'র্‌লে আমার মন স্থির থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিনে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই ব'ল্‌লেম।

সতীশের প্রবেশ।

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসীমা! আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মার্‌বো এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট ক'রেচো তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে? কে আমাকে ছেলেবেলা হ'তে নবাবের মতো সৌখীন ক'রে তুলেচে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের কল্লে? কে আমাকে পিতার শাসন হ'তে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আন্‌লে? কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো শুন্‌চো? তোমার সাম্‌নে আমাকে এম্‌নি ক'রে অপমান করে? নিজের মুখে ব'ল্লে কিনা খোকাকে গলা টিপে মার্‌বে? ওমা, কি হবে গো! আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি!

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিলো— সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হ'য়ে উঠ্‌তো না—তা-হ'তে চিরকালের মতো বঞ্চিত ক'রে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েচো, তাতে আমার বিষ জমে উঠেচে! সত্য কথাই ব'ল্‌চো, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন ক'র্‌তে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। কি সতীশ কি হ'য়েচে, তোকে দেখে যে ভয় হয়! অমন ক'রে তাকিয়ে আছিস্ কেন? আমাকে চিন্‌তে পার্‌চিস্ নে? আমি তোর মা সতীশ!

সতীশ। মা তোমাকে মা ব'ল্‌বো কোন্ মুখে? মা হ'য়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হ'তে আমাকে বঞ্চিত ক'র্‌লে? কেন তুমি আমাকে জেল হ'তে ফিরিয়ে আন্‌লে? সে কি মাসির ঘর হ'তে ভয়ানক? তোমরা ঈশ্বরকে মা

ব'লে ডাকো, তিনি যদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাইনে, তিনি যেন আমাকে নরকে দেন !

শশধর। আঃ সতীশ ! চলো চলো—কি ব'কচে' থামো ! এসো বাইরে আমার ঘরে এসো !

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শশধর। সতীশ একটু ঠাণ্ডা হও ! তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েচে সে কি আমি জানিনে ? তোমার মাসি রাগের মুখে কি ব'লেচেন, সে কি অমন ক'রে মনে নিতে আছে ? দেখো, গোড়ায় যা ভুল হ'য়েচে তা এখন যতোটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসি-মার সঙ্গে আমার যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গ'ল্‌বে না। এতোদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েচি তা যদি শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত শোধ ক'রে না দিতে পারি, তবে আমার ম'রেও শান্তি নাই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার ক'র্‌বে ?

শশধর। না, শোনো সতীশ—একটু স্থির হও ! তোমার যা কর্ত্তব্য সে তুমি পরে ভেবো—তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় ক'রেচি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই ক'র্‌তে হ'বে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেবো— সেটাকে তুমি দান মনে ক'রো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেচি—পশু' শুক্রবারে রেজেষ্ট্রী ক'রে দেবো।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কি আর ব'ল্‌বো—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা থাক্ থাক্ ! ও-সব স্নেহ-ফেহ আমি কিছু বুঝিনে, রসকস আমার কিছুই নেই—যা কর্ত্তব্য তা কোনো রকমে পালন কর্ত্তেই হ'বে এই বুঝি। সাড়ে আটটা বাজ্‌লো, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে ব'লেছিলে যাও ! সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিষ্টার ভাদুড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েচি। ভাবে বোধ হ'লো তিনি এই ব্যাপারে

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেন—তোমার প্রতি যে টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন কি, আমি চ'লে আস্‌বার সময় তিনি আমাকে ব'ল্লেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসে না কেন?

( সতীশের প্রস্থান )

ওরে রামচরণ, তোর মা ঠাকুরাণীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকুমারী। কি স্থির ক'র্‌লে?

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেচি!

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যতো চমৎকার হ'বে সে আমি জানি। যাহো'ক সতীশকে এ বাড়ি হ'তে বিদায় ক'রেচো তো?

শশধর। তাই যদি না ক'র্‌বো তবে আর প্ল্যান কিসের? আমি ঠিক ক'রেচি সতীশকে আমাদের তরফ মাণিকপুর লিখে প'ড়ে দেবো—তা হ'লেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হ'য়ে থাকৃতে পার্‌বে। তোমাকে আর বিরক্ত ক'র্‌বে না।

সুকুমারী। আহা কি সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেচো। সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না, না, তুমি অমন পাগ্‌লামি ক'র্‌তে পার্‌বে না, আমি ব'লে দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিলো।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায়নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাবো তোমার আর ছেলেপুলে হ'বে না!

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো আমাদের অন্যায় হ'চ্ছে। মনেই কর না কেন তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ করো তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌বো—এই আমি ব'লে গেলেম।

( সুকুমারীর প্রস্থান )

সতীশের প্রবেশ।

শশধর। কি সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশায়, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো দীর্ঘকাল পরে মিষ্টার ভাদুড়ির কাছ হ'তে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েচি! তোমার দানপত্রের ফল দেখো! সংসারের উপর আমার ধিক্কার জ'ন্মে গেছে মেসোমশায়! আমি তোমার সে তালুক নেবো না!

শশধর। কেন সতীশ?

সতীশ। আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখভোগ ক'র্‌বো না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ ক'র্‌বো, তার চেয়ে এক কানা কড়িও আমি বেশি চাই না, তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমাব সম্পত্তিব অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েচো তো!

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ সে একরকম ক'রে হ'বে। হঠাৎ তিনি রাজি না হ'তে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে ব'লেচো?

শশধর। হাঁ, ব'লেচি বইকি! বিলক্ষণ! তাঁকে না ব'লেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন।

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো ক'রে বুঝিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাইনে। তুমি তাঁকে ব'লো আজ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্ন খাইয়েচেন তা উদ্গার না ক'রে আমি বাঁচ্‌বো না! তাঁর সমস্ত ঋণ সুদশুদ্ধ শোধ ক'রে তবে আমি হাঁফ ছাড়্‌বো!

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ—তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায় আর ঋণ বাড়াবো না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অনুরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হ'বে।

শশধর। পার্‌বে তো!

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্ব্বার মাসিমার অন্ন খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হ'বে।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম ক'রে কাজকর্ম্ম ক'র্‌চে। দেখো অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আলপাকার চাপ্‌কানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড় সাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন!

সুকুমারী। দেখো দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে ব'স্‌তে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিতো। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছো, তাইতো সতীশ মানুষের মতো হ'য়েচে!

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নাই কিন্তু স্ত্রী দিয়েচেন আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েচেন, তেম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'রেছেন—আমাদেরই জিত!

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হ'য়েচে, ঠাট্টা ক'র্‌তে হবে না! কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছো সে যদি আজ থাক্‌তো তবে—

শশধর। সতীশ তো ব'লেচে কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ ক'রে দেবে।

সুকুমারী। রইলো! সে তো বরাবরই ঐ রকম লম্বা-চৌড়া কথা ব'লে থাকে! তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে ব'সে আছো!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিলো, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জ্জন দিই!

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোক্‌সান হ'বে না এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি! ঐ যে তোমার সতীশ বাবু আস্‌চেন! চাক্‌রি হ'য়ে অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাট মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা। আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হ'বে না। এই দেখো আমার হাতে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খানকয়েক নোট আছে!

শশধর। ইস্! এ যে এক তোড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয়তো এমন ক'রে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হ'চ্চে না সতীশ!

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াবো না। মাসিমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা! বিস্তর অনুগ্রহ ক'রেছিলে—তখন তার হিসাব রাখ্‌তে হবে মনেও করিনি সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হ'তে পারে! এই পনোরো হাজার টাকা গুণে নাও! তোমার খোকার পোলাও পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক্!

শশধর। একি কাণ্ড সতীশ! এতো টাকা কোথায় পেলে!

সতীশ। আমি গুণচট্ আজ ছয়মাস আগাম খরিদ ক'রে রেখেচি—ইতিমধ্যে দর চ'ড়েচে; তাই মুনফা পেয়েচি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়াখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ—আর দরকার হ'বে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না!

সতীশ। তোমাকে তো দিই নাই মেসোমশায়! এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ ক'র্‌তে পা'র্‌বো না!

শশধর। কি সুকু, এ টাকাগুলো——

সুকুমারী। গুণে খাতাঞ্জির হাতে দাও না—ঐখানেই কি ছড়ানো প'ড়ে থাক্‌বে?

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেচো তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাবো।

শশধর। আঁা সেকি কথা! বেলা যে বিস্তর হ'য়েচে! আজ এইখানেই খেয়ে যাও!

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ ক'র্‌লেম, অন্ন-ঋণ আবার নূতন ক'রে ফাঁদ্‌তে পার্‌বো না!

[ প্রস্থান।

সুকুমারী। বাপের হাত হ'তে রক্ষা ক'রে এতদিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'র্‌লেম, আজ হাতে দু'পয়সা আস্‌তেই ভাবখানা দেখেচো! কৃতজ্ঞতা এম্‌নিই বটে! ঘোর কলি কি না!

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়ো সাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখ্‌বেন। মনে ক'রেছিলেম ইতিমধ্যে "গানির" টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে, তহবিল পূরণ ক'রে রাখ্‌বো—কিন্তু বাজার নেমে গেলো। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হ'তে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু অদৃষ্টকে ফাঁকি দেবো! এই পিস্তলে ছুটি গুলি পূরেচি—এই যথেষ্ট! নেলি—না না ও নাম নয়, ও নাম নয়—আমি তাহ'লে ম'র্‌তে পার্‌বো না। যদি বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে এসেচি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্ত কবুল ক'রে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইলো সে আমার এই পিস্তল! আমার অন্তিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চক্ষু মুদ্‌বো!

মেসোমশায়ের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যতো দুর্ল্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম এ বাগান একদিন আমারই হ'বে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ ক'রে নিচ্ছিলো, তা আমাকে তখন ব'লে নি—তা হোক্, এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি ষ্টিফানোটিস্ লতার কুঞ্জে আমার জন্মের হাওয়া-খাওয়া শেষ ক'র্‌বো—এখানে হাওয়া খেতে আস্‌তে আর কেউ সাহস ক'র্‌বে না!

মেসোমশায়কে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলি নিতে চাই। পৃথিবী হ'তে ঐ ধূলোটুকু নিয়ে যেতে পার্‌লে আমার মৃত্যু সার্থক হ'তো। কিন্তু এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন—আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আমি সাহস করিনে! বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

ম'র্‌বার সময় সকলকে ক্ষমা ক'রে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু আমি ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌লেম না। আমার এ ম'র্‌বার সময় নয়। আমার অনেক সুখের কল্পনা, ভোগের আশা ছিলো—অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই টুক্‌রা টুক্‌রা হ'য়ে ভেঙেচে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য অনেক নির্ব্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত সুখ জুটেছে, আমার

জুটেও জুটলো না—সে জন্য যারা দায়ী তাদের কিছুতেই ক্ষমা ক'রতে পা'রবো না—কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে—তাদের সকল সুখকে কাণা করে দেয়। তাদের তৃষ্ণার জলকে বাষ্প ক'রে দেবার জন্য আমার দগ্ধ জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি।

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনই বল নেই! আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ ক'রে দেবে—আর কারো গায়ে হাত দিতে পারবে না! আঃ—তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার ক'রে দিলে আর আমি ম'রেও তাদের কিছুই ক'রতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হ'বে না—তারা সুখে থাকবে, তাদের দাঁতমাজা হ'তে আরম্ভ ক'রে মশারি-ঝাড়া পর্য্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না—অথচ আমার সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবলো—আমার নেলি—উঃ ও নাম নয়!

ও কে ও! হরেন! সন্ধ্যার সময় বাগানে বা'র হ'য়েচো যে! বাপমাকে লুকিয়ে চুরি ক'রে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেচে। ওর আকাঙ্ক্ষা ঐ কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক ঊর্দ্ধে চড়ে নি—ঐ গাছের নীচু ডালেই ওর আধকাংশ সুখ ফলে আছে। পৃথিবীতে ওর জীবনের কি মূল্য! গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কি এমন বড়ো! এখনি যদি ভিন্ন করা যায়, তবে জীবনের কতো নৈরাশ্য হ'তে ওকে বাঁচানো যায় তা কে ব'লতে পারে? আর মাসিমা—ইঃ! একেবারে লুটাপুটি ক'রতে থাকবে! আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি! হাতকে আর সামলাতে পাচ্চিনে! হাতটাকে নিয়ে কি করি! হাতটাকে নিয়ে কি করা যায়!

(ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশঃ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।)

হরেন। (চম্‌কিয়া উঠিয়া) এ কি! দাদা না কি! তোমার ছুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমাব ছুটি পায়ে পড়ি—বাবাকে ব'লে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়—মেসোমশায়—এই বেলা রক্ষা করো—আর দেরি ক'রো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো!

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হ'য়েচে সতীশ! কি হ'য়েচে!

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হ'য়েচে আমার বাছার কি হ'য়েচে।

হরেন। কিছুই হয় নি মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্‌চেন!

সুকুমারী। এ কি রকম বিশ্রী ঠাট্টা! ছি ছি, সকলি অনাসৃষ্টি! দেখো দেখি! আমার বুক এখনো ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ ক'র্‌চে! সতীশ, মদ ধ'রেচে বুঝি!

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনি পালাও! নইলে তোমাদের রক্ষা নেই!

(হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন)

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হ'য়ো না! ব্যাপারটা কি বলো! হরেনকে কার হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য ডেকেছিলে?

সতীশ। আমার হাত হ'তে (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো এই দেখো মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কি সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছিস্‌ বল্‌ দেখি! আপিসের সাহেব পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাসি ক'র্‌তে এসেচে। যদি পালাতে হয় তো এই বেলা পালা! হায় ভগবান! আমি তো কোনো পাপ করিনি, আমারি অদৃষ্টে এতো দুঃখ ঘটে কেন?

সতীশ। ভয় নেই—পালাবাব উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়—যা সন্দেহ ক'র্‌চো তাই! আমি চুরি ক'রে মাসির ঋণ শোধ ক'রেচি। আমি চোর। মা, শুনে খুসি হবে, আমি

চোর, আমি খুনী! এখন আর কাঁদ্‌তে হবে না—যাও যাও আমার সম্মুখ হ'তে যাও! আমার অসহ্য বোধ হ'চ্চে!

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছো, তাই শোধ ক'রে যাও!

সতীশ। বলো, কেমন ক'রে শোধ ক'র্‌বো! কি আমি দিতে পারি! কি চাও তুমি!

শশধর। ঐ পিস্তলটা দাও!

সতীশ। এই দিলাম! আমি জেলেই যাবো! না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না!

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্ম্মের দ্বারাই শোধ হয়! তুমি নিশ্চয় জেনো আমি অনুরোধ ক'ল্লে তোমার বড়ো সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হ'তে জীবনকে সার্থক ক'রে বেঁচে থাকো!

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কতো কঠিন তা তুমি জানো না—মর্‌বো নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হ'তে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেচি--এখন কি নিয়ে বাঁচ্‌বো।

শশধর। তবু বাঁচ্‌তে হবে, আমার ঋণের এই শোধ—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পার্‌বে না!

সতীশ। তবে তাই হ'বে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো! তোমার মাকে আর মাসীকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করো!

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারো—তবে এ সংসারে কে এমন থাক্‌তে পারে যাকে আমি ক্ষমা ক'র্‌তে না পারি ( প্রণাম করিয়া ) মা, আশীর্ব্বাদ করো আমি সব যেন সহ্য ক'র্‌তে পারি—আমার সকল দোষগুণ নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ ক'রেচো সংসারকে আমি যেন তেম্‌নি ক'রে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কি আর ব'ল্‌বো! মা হ'য়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই ক'রেচি তোর কোনো ভালো ক'র্‌তে পারিনি—ভগবান্ তোর ভালো করুন! দিদির কাছে আমি একবার তোর হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নিইগে। ( প্রস্থান )

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার ক'রে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ।

নলিন। সতীশ!

সতীশ। কি নলিনী!

নলিনী। এর মানে কি? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচো?

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক! আমি তোমাকে প্রতারণা ক'রে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলি উল্টা হয়। তুমি মনে ক'র্‌তে পারো তোমার দয়া উদ্রেক ক'র্‌বার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন আমি অভিনয় ক'র্‌ছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞারক্ষা ক'র্‌বার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কি তুমি পাগলের মতো ব'ক্‌চো? আমি তোমার কী অপরাধ ক'রেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে—

সতীশ। যে জন্য আমি এই সঙ্কল্প ক'রেছি সে তুমি জানো নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করিনি তবু কি আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে?

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐ জন্যই আমার রাগ ধরে! শ্রদ্ধা ছি, ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে! তুমি যে কাজ ক'রেছো আমিও তাই ক'রেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখিনি। এই দেখো আমার গহনাগুলি সব এনেচি—এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ মায়ের। আমি তাঁহাদিগকে না ব'লে এনেচি, এর কতো দাম হ'তে পারে আমি কিছুই জানিনে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হ'বে না?

শশধর। উদ্ধার হ'বে, এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েচো তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হ'বে।

নলিনী। এই যে শশধর বাবু, মাপ ক'র্‌বেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি——

শশধর। মা, সে জন্য লজ্জা কি! দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না! সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেচেন দেখ্‌চি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হ'য়ে অতিথিসৎকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

( ১৩০১—ভাদ্র )

---

# গুপ্তধন

## ১

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যূষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠাল কাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড় বড় গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোট মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল—কেহ তাহা ভাঙ্গে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারিদিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মত হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, "জয় হোক্ বাবা!"

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন —"বাবা তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল—কহিল,—"আপনি অন্তর্য্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ কর শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পর দিন প্রত্যূষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী "জয় হোক্ বাবা" বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি চাও"-- হরিহর কহিল, "বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন! এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু ছিলাম, আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভাল নয়, কাজেই ইহাদের অহঙ্কার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কি করিলে আবার আমাদের বংশ বড় হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোট হইয়া সুখে থাক। বড় হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড় করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠিপত্রের মত গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা, আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরূপ :——

পায়ে ধ'রে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা॥
তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা কর। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন-ঐশ্বর্য্য পাইবে, জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না ?"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে !"

এমন সময় হরিহরের ছোট ভাই শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড় হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই সুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ ইহার রহস্য কেবল একজন মাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর কেহ তাহা পারিবে না! তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোট ভাই শঙ্কর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শঙ্কর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও না !"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল! সে কাগজ কি আছে! বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শঙ্করকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম্ম নষ্ট হইল—গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের ধ্যান এক মুহূর্ত্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড় ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকুরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্ত মনে এই লিখন পাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদের বড় ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতে মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। একবৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধরাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী! তাড়াতাড়ি হুঁকাটা রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে ওখানে কি আছে?"

মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন সহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে

ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল—তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবাল তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে' সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনো মতেই এই ক'টা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। "রা নাহি দেয় রাধা" অতএব "রাধা"র "রা" নাহি থাকিলে "ধা" রহিল—"শেষে দিল রা" অতএব হইল "ধারা"—"পাগোল ছাড় পা"—"পাগোল" এর "পা" ছাড়িলে "গোল" বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল "ধারাগোল"—এ জায়গাটার নাম তো "ধারাগোল"ই বটে!

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্ব্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্নে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারিদিকে পথ আর কুমুদের বন।

পাথরে বাঁধান ঘাট ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিম পাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক্, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল এই গাছটাকে কোনো মতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে; অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না; তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুসি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কি যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক অক্ষরে লেখা আছে:—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্ঞা

করিয়াছে! আজ অভীষ্ট সিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল! এখন যে তাহার কি কর্ত্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল সে হয়ত তাহার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না!

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছু দূর ঘন বনমধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশ্বত্থগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে এক মনে অঙ্ক কসিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এই জন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কসিতেছে, আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে,—কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্ব্বার আসিয়া অঙ্ক কসিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এম্‌নি করিয়া রাত্রি যখন অবসন্ন প্রায়—যখন নিশান্তের শীত বায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখন-পত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্যভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না। তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই, কিন্তু দিনের

বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্ততঃ কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কসিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনও প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারিদিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেই খানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরু ভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অম্‌নি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল!

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনায় বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁৎলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্ব্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না—কোথাও রন্ধ্র নাই—এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এম্‌নি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্ব্বার গণনা সারিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসঙ্কেত অনুসরণ পূর্ব্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন—"আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনো মতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখা প্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সঙ্কীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মত জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি!"

যেমন বলা অম্‌নি সেই ঘরের ভাঙ্গা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেই সঙ্গে আর একটি কি সচেতন পদার্থ ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চম্‌কিয়া উঠিতেই তাঁহার —হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কোনও উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চক্‌মকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "একি মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা মাপ কর। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সাম্‌লাইতে পারি নাই—পিছ্‌লে পাথরশুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পাটা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া গেছে।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইত!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সঙ্কেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মত তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে "পাইয়াছি" তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ঐ গর্ত্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম কিন্তু শরীর দুর্ব্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল—তাই পড়িয়া

গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল সেও ভালো—আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগ্লাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোনমতেই না! যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ-ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে—এ ধন তুমি কোনও দিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না—আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ-ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনও লইতে পারিবে না।"

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন—"মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোন! সমস্ত কথা তোমাকে বলি।"

"তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শঙ্কর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আমি সেই শঙ্কর।" মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবী সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবী নষ্ট করিয়া দিল।

শঙ্কর কহিলেন—"দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেই দিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

কত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন

নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনও সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

অবশেষে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ূন পর্ব্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, "বাবা, তৃষ্ণা দূর কর তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে!"

তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। এক-দিন পর্ব্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনীতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না!

কাগজখানার যখন কোনোও চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি-দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল মুক্তির অপূর্ব্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর কোনও ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

ইহার অনতিকাল পরে পরমহংসবাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-এক দিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত।

এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম, তাহার যে নাগাল

পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, "এখানে আর থাকা হইবে না, এ-বন ছাড়িয়া চলিলাম।"

কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক্‌ না, কি আছে। কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম ; কোনও ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম ! সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কি ছিল !

তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরীবরা তো গৃহী, সেই গুপ্তসম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জ্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনও চিন্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মত অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না ; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়াছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনও রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সঙ্কেত ভেদ করলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

এই সঙ্কেতটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সঙ্কেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই "পাইয়াছি" বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি !"

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো

ধনের কোনও প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

শঙ্কর কহিলেন, "আজ আমার শেষবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে! তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আমি দেখিলাম! আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোক-শিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করেব পা ধরিয়া পুনরায় কাতরস্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, তবে তোমার এই লিখনটি লও! যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইও।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া কর, আমাকে ফেলিয়া যাইও না—আমাকে দেখাইয়া দাও!"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি, কি দিন, কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনও উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর একবার হাত-ড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানাস্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী তুমি কোথায়!"

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত

হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি—কি চাও বল!"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও!"

তখন আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনও সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ওগো আছ কি?"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল—"এইখানেই আছি। কি চাও?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর কিছু চাই না—আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও!"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলে—"তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চক্‌মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে এস মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই!"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে? এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না?"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কি নিষ্ঠুর!"—বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনও পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনও অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক, আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্রের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার কর।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধর। আমার সঙ্গে চল।"

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর

উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "দাঁড়াও!"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা পড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন—"এস।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্মকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন একি আশ্চর্য্য দৃশ্য! চারিদিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্য্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল—"এ সোনা আমার—এ আমি কোনো মতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা ফেলিয়া যাইও না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড় এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বার বার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারিদিকে সোনা ঝক্মক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীর উপরে হয় তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধগন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাঁতিহাসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে,

আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্দ্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর একরাশি পিতল কাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল—"ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর, আছো কি ?"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন—"কি চাও ?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"আমি বাহিরে যাইতেই চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার ছুটো একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না ?"

সন্ন্যাসী তাহার কোনও উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাত্‌লা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোম্‌ড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারিদিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনও বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনও বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে! মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মত সে ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণলুব্ধ রাজা মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে!

এম্‌নি করিয়া যতক্ষণ পারিল, মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারিদিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!"

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না—এক একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া

মারিতে লাগিল, কোনও ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে।

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ঐ সোনার স্তূপ চারিদিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না! ইহারা এই চির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া রহিয়াছে!

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে? আহা সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়! তাহার পরে কুটীরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের, ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা ল্যাজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল মুদি কি সুখেই আছে! আজ কি বার কে জানে! যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথীকে ঊর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়া নৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া শস্যক্ষেত্রের আল বহিয়া, পল্লীর শুষ্ক বংশপত্রখচিত অঙ্গণপার্শ্ব দিয়া চাষীলোক হাতে দুটো একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নীজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটি মাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও!"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুরঙ্গ হইতে অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই! আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আচ্ছা তবে এস।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন—"এখানি লইয়া তুমি কি করিবে?"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

---

# মাষ্টার মশায়

## ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দ-সমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড় জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জ্জিতলাওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকা গাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট-হ্যাট্-পরা বাঙালি বিলাতফের্ত্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধু মহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন—“মজুমদার গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।”

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্কষ্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর একবার ইংরাজী শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল—“এ কি! এ তো আমার পথ নয়!” তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, “হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।”

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠেসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল—এ-কি ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কি রকম ব্যবহার সুরু করিল। "এ-ই, গাড়োয়ান্, গাড়োয়ান্!"—গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল—কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো!" সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেই সা'ব ভিতর নেহি জায়েগা!"—শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্‌দি ভিতর আও!"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—কিছুই দেখিতে পাইল না, তবে মনে হইল পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনো মতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান্, গাড়ী রাখো।"—বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনো মতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়া ছুটা রেড্ রোড়ের রাস্তা ধরিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে কাঁহা যাতা!"—কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনো মতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সঙ্কীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে করিল—কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল—যে, কোনো প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন Nature abhors vacuum—তাই তো দেখ্‌ছি! কিন্তু ওটা কিরে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনি ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব্ব একটা কিছু ঘটে।—"পাহারাওলা" বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বহুকষ্টে এম্‌নি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে অত্যন্ত

ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল চট্ করিয়া এক লম্ফে সাম্‌নের আসনে গিয়ে বসিবে। যেম্‌নি মনে করা অম্‌নি অনুভব করিল সাম্‌নের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনো মতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দ্দেশ চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এদিকে গাড়িটা কেবলি ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দু'টো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলি বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়খড়েগুলো থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া বারংবার শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো!"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন?"

গাড়োয়ান আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই!"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল—"তবে এ কি শুধু স্বপ্ন?"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল—"বাবু সাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলি ভাবিতে লাগিল, "সেই চাহনিটা কার!"

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ সরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড় হৌসের মুচ্ছুদিগিরি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধর বাবু বাপের উপার্জ্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্কীতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এদিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম দান ধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত. ইহাই তিনি গর্ব্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধর বাবু বড় বাড়ি ও গাড়ি জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া দলিলের সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এম্‌নি কষাকষি যে পাড়ার ফুট্‌বল্ ক্লাবের না-ছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হ'ল না, ছেলে হ'ল না করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মা'র ধরণের। বড় বড় চোখ, টিকলো নাক, রং রজনীগন্ধার পাপ্‌ড়ির মতো,—যে দেখিল সেই বলিল, 'আহা ছেলে তো নয় যেন কার্ত্তিক।' অধর বাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড় ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্ব্বে অধর বাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসার খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনো দিন খাটান নাই। দু'টো একটা সখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না ;—বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা কিছু দাবী উত্থাপিত করিলেন, সব ক'টাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাই-ই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাষ্টার রাখিলেন। এই মাষ্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্য্যন্ত মাষ্টারি মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলি বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন—"ও তোমার কেমন মাষ্টার! ওকে! দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও!"

বুড়া মাষ্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেম্‌নি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাষ্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বলিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এম্‌নি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাষ্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফঃস্বলের এণ্ট্রেন্স স্কুলে কোনো মতে এণ্ট্রেন্স পাশ করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মত সরু হইয়া আসিয়াছে,

কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মত প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্য্যের আলো যেমন ঠিক্‌রিয়া পড়ে তেম্‌নি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও? কাহাকে চাও?"—হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল—"বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"—দরোয়ান কহিল—"দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল—"বাবু চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ্‌ চড়িল—সে কহিল, "নেহি জায়গা!" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপ্‌ চাপ্‌ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন লইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সে দিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাষ্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার পড়া কি পর্য্যন্ত?"

হরলাল একটুখানি মুখ নীচু করিয়া কহিল—"এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল—"শুধু এণ্ট্রেন্স পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাৎ কম দেখি না।"

হরলাল চুপ্‌ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"কতো এম-এ বি-এ আসিল ও গেল—কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনা বাবু এণ্ট্রেন্স্‌-পাস-করা মাষ্টারের কাছে পড়িবেন?"

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—"যাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু

রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্য্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারী সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ;—সে মনে মনে ভাবিতেছিল এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে, তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাষ্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এম্‌নি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতি-পূর্ব্বে কখনো ঘটে নাই। কি করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে এই আশায় সে বহু কষ্টে বই যোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশু বয়স কেবল সঙ্কোচে কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্য প্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনো দিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বইও ভাঙ্গা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ-দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া

চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মত করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপাপড়া হরলাল নিজেও জানিত না তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়াছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিষ আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে ;—একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন বছরের বোন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড় ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল—"আমাদের সোনাবাবুকে মাষ্টার মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালের মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাৎ করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে!

৪

বেণুর বয়স এখন এগার। হরলাল এফ্‌-এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক

ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট্‌ ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জ্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়স্‌ সীজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যাণ্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মত হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত, তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণুই স্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিল—"তুমি মাষ্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে—দিনরাত উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক! আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে! আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য!"

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল, যে, তাহার জানা তিন চার জন লোক, বড়মানুষের ছেলের মাষ্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইসারা করিয়া যে এ সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ্‌ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা

শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড় মানুষের ঘরে মাষ্টারের পদবীটা কি। গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেম্‌নি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাষ্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় একটা স্পর্দ্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্য্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থ-সাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোট ছোট রাস্তা ও ছোট গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চ্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মাষ্টার মশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাষ্টার মশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা

জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল, তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল বিকাল হইতে তোর কি হইয়াছে বল্ দেখি! মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস্ কেন—ভালো করিয়া খাইতেছিস্ না—ব্যাপারখানা কি!"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"মাষ্টার মশায়——"

মা কহিলেন—"মাষ্টার মশায় কি?"

বেণু বলিতে পারিল না মাষ্টার মশায় কি করিয়াছেন। কি যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন—"মাষ্টার মশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!"

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড় চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিশকে খবর দেওয়া হইল। পুলিশ খানাতল্লাসীতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে?"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীশুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন? যাহার যখন খুসি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাষ্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই

ভালো হয়—না হয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল—"এ তো অতি ভালো কথা——উভয়পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নীচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না—অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের প্যাট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত সে দড়িটা আছে, কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত তাহার বদলে সেখানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালী মাছ ঝক্‌ঝক্ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাষ্টার মশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নামলেখা একটা কাগজ আঁটা। আর একটি নূতন ভালো বাঁধাই-করা ইংরেজি ছবির বই তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, বাবা, মাষ্টার মশায় কোথায় গেছেন? বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোষের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আট্‌কাইয়া গেল ;—কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া

পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল—"মাষ্টার মশায়, আমাদের বাড়ি চল।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল যেমন করিয়া হউক্ মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের প্যাঁট্‌রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল "আমাদের বাড়ি চল"—এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিঃশ্বাস রোধ করিয়াছে—কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল—বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা-নিশাচর বাদুড়ের মত আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত আঁকযোগ পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল এ সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ওদিকে মাকেও দু'চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলাল সৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারী করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড় সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু'চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ লোকটা চলিবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল,—"না।" "কোনো বড়লোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়লোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরও খুসি হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ কর, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।"—তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"পনেরো টাকা আগাম দিতেছি—আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈয়ারি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইলে, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড় সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরাণীরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এম্‌নি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরাণীরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন,—"বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মা, ঐটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—"তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস্, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব? রোস, একটা বড় বাসা করি, তাহার পর তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোট গলি হইতে বড় গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাড়িতে তাহার বাসা পরিবর্ত্তন হইল। তবু সে কি জানি কি মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতে মন স্থির করিতে পারিল না।

হয় তো কোনো দিনই তাহার সঙ্কোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল—তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেম্‌নিটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড় হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধু মহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগী টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আস্‌বাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজার দর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, 'আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মত গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্ধুকে কোম্পানীর কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্!' ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল

স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকাল বেলায় তাহার মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ি চল। সে বেণু নাই সে বাড়ি নাই, এখন মাষ্টার মশায়কে কেই বা ডাকিবে!

হরলাল মনে করিয়াছিল এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল, লাভ কি—বেণু হয় তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—আহা বাছার মা মারা গেছে!"

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।" বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোকাবাবু আছি?"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্ত্তিকের মত ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, আহা এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল!

আহার সারিয়াই বেণু কহিল—"মাষ্টার মশায়, আমাকে আজ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়ি গাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস্। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল—"বাস্, এই পর্য্যন্ত! আর কখনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাষ্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু আমি সামান্ত হরলাল মাত্র!"

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ! ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায়?" বেণু বলিয়া উঠিল—"মাষ্টার মশায়, আমি।"

হরলাল কহিল—"এ কি ব্যাপার? কখন আসিয়াছ?"

বেণু কহিল—"অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই কহা নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুই জনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—"সব ভাল তো? কিছু বিশেষ খবর আছে?"

বেণু কহিল, "পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেণ্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে-ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে হয়—তাহার বড় লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।"

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি ইচ্ছা?"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, ব্যারিষ্টার হইয়া আসে।

তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে, তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণু কহিল—"জানাইয়াছি। বাবা বলেন পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ্ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল—"আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।—বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।"

হরলাল কহিল—"চল আমি সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল—"না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ কথা বলাও বড় শক্ত। হরলাল ভাবিল, আর একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল—"না, আমার ক্ষুধা নাই—আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল—"সে কি হয়?" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুসি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন—"বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"—বলিয়া সে চলিয়া যাইবার

উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"রোস, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল—"না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া ম তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও বাছা!"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছুই খাইতেছে না—খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্ মচ্ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মৎলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিশ কেস্ করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব!" —এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"চল্! ওঠ!" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কি কারণে মফঃস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে

হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত আট হাজার টাকা লইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইত। পাইকেড়দিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফঃস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহার যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্ত্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুই জন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড় সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে—চৈত্র পর্য্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন—সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেকে না। আমি বেণুকে তোর ছোট ভাইয়ের মত, আপন ছেলের মতই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।"—এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে। পূর্ব্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি দুই চার দিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে

করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্কটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাষ্টার মশায়ের কাছে আসিয়াছে ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল—"যেমন করিয়া হোক্ বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই!"

হরলাল কহিল—"অধরবাবু কি যাইতে দেবেন?"

বেণু কহিল—"আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যে রকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল—"কি কৌশল?"

বেণু কহিল—"আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলেত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল—"তোমাকে টাকা ধার দিবে কে?"

বেণু কহিল—"আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"আমি!"—তাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল—"কেন আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।

হরলাল হাসিয়া কহিল—"সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেম্নি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কি তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্য দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন।

বেণু কহিল—"আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? না হয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল—"তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয় তো দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল—"বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন?"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া কিনিয়া টাকা দিতাম। কিন্তু একটি মাত্র অসুবিধা এই যে বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরণের। সৌখীন ধুতি চাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট্ ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "একি ব্যাপার? এত রাত্রে এ বেশ যে?"

বেণু কহিল—"পর্শু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুসি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কি রকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল, পৃথিবীতে গরীব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কি বলিয়া সে যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল এমন একটা বেদনার সময় বেণু কি করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল! সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহুকষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "হাঁ,—আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগুলি গণিয়া আয়রণ চেষ্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল, "আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত

ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযত স্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এম্‌নি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ এক সময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন—"বাবা আজ রাত্রে এইখানেই থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল—"না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল—"মাষ্টার মশায়, এই আংটি ঘড়িগুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক্। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনি আয়রণ সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর কোনদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া টাকা গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এক একটা থলিতে ভর্ত্তি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্ব্বেই গণা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিল—বেণুর মা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চ-স্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দ্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পান্না হীরার অলঙ্কার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দ্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণ-পণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কি একটা ভাঙ্গিয়া পর্দ্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,—চম্‌কিয়া চোখ্‌ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জান্‌লায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফঃস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কি বাবা, উঠিয়াছিস্‌?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বাবা, আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস্‌। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে?"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাক বাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল—দুই তিনটা নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছি। থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায়

থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলি বাতি উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন! তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাত যাবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেই জন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিষ—এ আমারই জিনিষ। এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দু'খানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কি উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতার সহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ

প্রতিকূলতাকে যেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়াছে—সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল —গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কোথায় গিয়াছিলে?"

হরলাল বলিয়া উঠিল—"মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।"—বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওমা, কি হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল—"মা, তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন,—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল!"

হরলাল কহিল, "মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও!"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আফিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল—"বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল—"আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল—"তবে কখন যাইবেন?"

হরলাল কহিল—"সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল—"এ কথা বলি কাহাকে? এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব?"

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্‌লেট, চিক, সিঁথি, মুক্তার মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এ-ও তো চুরি! এ-ও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাও বাবা?"

হরলাল কহিল—"অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন ঐ যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তবে তোমার আর মফঃস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল—"না।"—বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল—অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন—ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল—"আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল !"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল—"আমার সাম্‌নে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি না হয় উঠি !"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আঃ বোস না !"

হরলাল কহিল—"কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কি আছে ?

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাষ্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো ? জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে—তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বক্‌শিস্ পাইবে ?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিশে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছ ! হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ ! এ ধার আমি শুধিব না !"

হরলাল কহিল—"আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন—"তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে ! তোমার বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়াছে ?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল—"ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন ?"

যাহা হউক গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন অসাড় হইয়া গেছে। ভয়

করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কি হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সুমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চম্‌কিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরূপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল—গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন?"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড় সাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে—তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল—"তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গেল?"

হরলাল—"জানি না"—এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ্ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল—"টাকা কোথায় আছে দেখিব চল।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গণিয়া চারিদিক্ খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সাম্‌নেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরে হরলাল, কি হইল রে?"

হরলাল কহিল—"মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন—"চুরি কেমন করিয়া যাইবে? হরলাল এমন সর্ব্বনাশ কে করিল!"

হরলাল কহিল—"মা, চুপ কর।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"এ ঘরে রাত্রে কে ছিল?

হরলাল কহিল—দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল—"আচ্ছা বড় সাহেবের কাছে চল।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল—"সাহেব আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনই পরের টাকায় হাত দিবে না!"

সাহেব বাঙ্গলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা!"

হরলাল কহিল, "মা তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি!"

মা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—"তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস্ নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন, "সত্য করিয়া বল ব্যাপারখানা কি?

হরলাল কহিল—"আমি টাকা লই নাই।"

বড় সাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল,—"আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড় সাহেব কহিলেন—"দেখ হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড় লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আন—তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনই করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারটা হইয়া গেছে।

হরলাল যখন মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুসি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কি, উপায় কি, উপায় কি—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ান থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয় স্থান তাহাই এক মুহূর্ত্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁস-কলের মত হইয়া উঠিল। ইহার কোনও দিকে বাহির হইবার কোনও পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতি ক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; স্যাকরাগাড়ি ভর্ত্তি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, বাবু ঠিকানা পড়িয়া দাও,—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভর্ত্তি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। সহরের সমস্ত কাজকর্ম্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনও বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মত দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখন বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মত ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে

হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মত চুপ্ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সেকথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্তদিন পর্য্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ্ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিশের লোক বা আর কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ

নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে-তো একটা ভয় মাত্র, সে-তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না;—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে অপমানের মধ্যে অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল—"বাবু ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বল!"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

"কোথায় যাইতে হইবে" হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

[ ১৩১৪—আষাঢ়, শ্রাবণ ]

# রাসমণির ছেলে

১

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি—কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই—শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলন্দি তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়াপরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন

ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোক যাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন কি, তাঁহার বড়ো ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বৎসরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি নিজে এক পয়সা লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন কি ইহা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অখণ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে ইহা গ্রামের লোকের কাহারো ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পৃথক্ করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন ;—বলিয়াছেন, "বাবা, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি তো স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে ; আমার এতো হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কি।"—শ্যামাচরণ সে-কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এম্নি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধিসম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মত থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্ম্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না—কেবল মাঝে মাঝে

এক একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না, কারণ, চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

এদিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজকর্ম্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কি জানি কোন্‌দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।"

পৃথক্‌ হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ-কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে-সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন—তাহার যে কোনো একটা জায়গায় জোড় আছে, এবং জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায় সহসা সে-সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশয়, কাণ্ড কি! আপনি এত ভাবিতেছেন কেন? বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন—"সত্য না কি! আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিলক্ষণ! জানেন না তো কি? দেশশুদ্ধ লোক জানে পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতেই আপনাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া দিয়াছেন—সেই ভাবেই তো এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।"

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ি?"

তারাপদ কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।"

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া তাঁহার ঔদার্য্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন—তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা! আলন্দি তালুক তো আমার খোরপোষের জন্য আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম—তাহার আয়ও তো তেমন বেশি নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন?"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ঐ তালুক ছাড়া আর কিছু দেন নাই।"

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, "সে-কথা বলিলে আমি শুনিব কেন? কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন—তাহার একপ্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্ধুকে আছে।"

সিন্ধুক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে। নাম বগলাচরণ। সকলে বলে তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা, আর ছেলেটি মন্ত্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক্ তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, "উইল না-ই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্ধুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে

পাইলেন, লক্ষ্মীপেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য—সামান্য দুটো একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর আলন্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশমর্য্যাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

২

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মত বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্ত্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বার বার করিয়া বলিতেন, "ধর্ম্মে ইহা কখনই সহিবে না।" ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আমি আইন আদালত কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্ত্তার সে উইল কখনই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে।

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাস-বাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্বনার জিনিষ। সতী সাধ্বীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে এ-কথা নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ-বিশ্বাস তাঁহার আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল —কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাঁহার কাছে আরো অনেক বড় করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই যে পূর্ব্বেকার চালচলনের ব্যত্যয়, এ যেন দু'দিনের একটা অভিনয়মাত্র—এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের

মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেককালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন, তিনি ভাবিলেন ইহারা জানেনা এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য—তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে, ইহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্ত্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ-সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কতবার পূজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু ভৃত্যে, ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, না হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রারদল আনিবার প্রয়োজন আছে কিনা তাহা লইয়া উভয়পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্যবশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফন্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপরে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক একবার চঞ্চল হইত;—তাহার কারণ এ নয় যে নববধূ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সখ ছিল—বরঞ্চ সেবক ও অন্নের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন—কিন্তু যাহার ঐশ্বর্য্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। স্বয়ং স্বর্গীয় কর্ত্তা অভয়াচরণ

আবার এ-ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠিতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতেই ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্য্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মত সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাব্‌টি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্ব্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনুকূল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্ত্তব্য আছে! আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, এ-বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল—"আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।" তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীর স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনো দিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন—ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব বংশে স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত—চৌধুরীদের মানমর্য্যাদা সম্বন্ধে ঠিক মত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন—বলিতেন, "আমি গরীবের মেয়ে মান-সম্ভ্রমের ধার ধারি না, কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্‌ সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য।"—উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ-বংশে লুপ্ত সম্পদের শূন্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না যাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল সকলের চেয়ে

বড় এই মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগমাত্র করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড় অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেন না, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাৎ ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ-পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিত দল এখনও তাঁহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারো কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ-সংসার সচ্ছল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহাবৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকাফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে—সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। আজ ইহাদিগকে কোনো প্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ করে—এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা' ছাড়া ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি করাইয়া লওয়া—তাহাতে আশ্রয়দানের মূল্যই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণির উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তুর করিয়া

চলিতে থাকিলে মানুষকে বড় কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। যাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর—অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে যাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন, অন্নদাতারও সুখ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে—তালুক ব্রহ্মত্র অল্পস্বল্প যা-কিছু এখনো বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে এত কষাকষি কোনো দিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্যুর ঠিক উল্টা, সে বাহির হইতে জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনো দিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াৎ করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্য্যন্ত তাঁহার সতর্কতার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখনো কখনো মৃদুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন ;—তিনি গরীবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়মানুষিআনার কিছুই বোঝেন না এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া,—ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন ; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনো দিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক্—তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্ব্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্ত্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। "তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এসব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরুদ্যম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা

সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকাতে সে-বিষয়ে স্ত্রীকে অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই;—এই তাঁহার অকর্ম্মণ্য সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দু-ই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়ের কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন এবং পুরুষমণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত সঙ্কোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন সেই নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।

এপর্য্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, বেচারা করিবে কি, উহার দোষ কি, ও বড়মানুষের ঘরে জন্মিয়াছে—ওর তো উপায় নাই! এই জন্য তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাবসত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভ্যস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে, বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল, কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারৎপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে-কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না—হয় তো বলিতেন, "ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!" বলিয়া নিজের কল্পিত অসতর্কতাকে ধিক্কার দিতেন। নয় তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নূতন কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন,—ভবানীচরণ তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার

জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে-কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত—ভবানীচরণ অম্লান মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর—তাহার পর কি হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে—সেখানে যে খুসী আসে যায়—কে চুরি করিয়া লইয়াছে।

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাঁহারই গর্ভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে শক্তসমর্থ কাজের লোক—অনায়াসে দুঃখ সহিবে এবং খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না ওটা নহিলে অপমান বোধ হয় এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া পরায় খুব মোটা রকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুমশায়কে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপ শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড় মুস্কিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না। এ-ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি খায় এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়!

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে কর্ত্তাদের আমলে নূতন সাজ-সজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর

জন্য যে সস্তা কাপড় জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেককালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুসি হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছু জানেনা—তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক? কিন্তু ভবানীচরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানেনা বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্ব্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরো আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগম হইয়াছে। তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপুত্রটি প্রতি বৎসর পূজার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে নানা প্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা সৌখীন জিনিষ আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালী, ছিপ-ছড়ি-ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে কেনা নানা রঙের রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা পাড়ওয়ালা সাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য্য মেমের মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। তা'র কোন্ একজায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজকে পাখা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্ত্তির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে এই জন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারীর মত তাঁহার অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন—"পাগল হইয়াছ।"

ভবানীচরণ চুপ্ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা দেখ, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও সেটার তো প্রয়োজন নাই।"

রাসমণি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কি ?"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে উহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়।"

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার কবিরাজ তো সব জানে !"

ভবানীচরণ কহিলেন—"আমি তো বলি রাত্রে লুচি বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়া আজ পর্য্যন্ত তোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ !"

ভবানীচরণ সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত—কিন্তু সেদিকে ভারি কড়াক্কড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না—কিন্তু বাহুল্য হইলেও এ-বাড়িতে বাবুরা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনো দিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমমূর্ত্তিটি ভবানীচরণের দই-পায়স-ঘি-লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন, তবু আজ তাঁহার টাকা

নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না এ-কথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সঙ্কোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন—"সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই—তাই মনে করিয়াছি এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেয়ে অল্পদামের কোনো জিনিষ যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না—কিন্তু সে জানিত এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না—গ্রামের লোকেরা তো নিন্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটারকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কি হইল? ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, "রোস্—এখন কি! সপ্তমী পূজার দিন আগে আসুক্।"

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যকর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কি একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথা-প্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।

রাসমণি কহিলেন—"বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন? ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না!"

ভবানীচরণ কহিলেন—"দেখ নাই! ও চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকে। কি যেন ভাবে।"

রাসমণি কহিলেন—"ও একদণ্ড চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম! ওর আবার ভাবনা! কোথায় কি দুষ্টামি করিতে হইবে ও সেই কথাই ভাবে।"

দুর্গপ্রাচীরের এ-দিকটাতেও কোনো দুর্ব্বলতা দেখা গেল না—পাথরের

উপরে গোলার দাগও বসিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খুব কসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুঁইতে পারিলেন না। বলিলেন, "ক্ষুধা একেবারেই নাই।"

এবার দুর্গপ্রাচারে মস্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষষ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাকনাম ধরিয়া বলিলেন— "ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তোমার অন্যায় আবদার ঘুচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাতে লোভ করিলে অর্দ্ধেক চুরি করা হয়, তা জান!"

কালীপদ নাকীসুরে কহিল—"আমি কি জানি! বাবা যে বলিয়াছেন ওটা আমাকে দেবেন।"

তখন বাবার বলার অর্থ কি, রাসমণি তাহা কালীপদকে বুঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত স্নেহ কত বেদনা অথচ এই জিনিষটা দিতে হইলে তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি কত দুঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই—তিনি যাহা করিতেন, খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সঙ্গেই করিতেন —কোন আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেই জন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এম্নি মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু মেমের দিক হইতে মন একমুহূর্ত্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন—কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি রাগই কর আর কান্নাকাটিই কর যাহা পাইবার নয় তাহা কোনমতেই

পাইবে না।”—এই বলিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

কালাপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতে-ছিলেন। দূর হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এম্‌নি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল—“বাবা, আমার সেই মেম্‌—”

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না। কালীপদর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—“রোস, বাবা, আমার একটা কাজ আছে—সেরে আসি, তা’র পরে সব কথা হ’বে!”—বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন কালীপদর মনে হইল, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকাল বেলাকার করুণসুরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোন কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিযাই বুঝা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “মা, আমি সেই পাখা-করা মেম চাই না।”

মা তখন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুপারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া কি পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামাভরা কাটা ও আকাটা সুপুরি ফেলিয়া রাসমণি তখনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল আজও দধি পায়েসের সদ্গতি হইবে না, এমন কি মাছের মুড়াটা আজও সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপাস্থত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন তখনি এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দধি পায়স ও মাছের মুড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনি এটা বাহির কবিতে হইল। বাক্সের ভিতর হইতে সেই মেমমূর্ত্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ-নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, "আজ রান্নাটা বড় উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর দইটা যে কি চমৎকার জমিয়াছে সে আর কি বলিব।"

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখাখাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধুদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোন অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই পুতুলের একঘেয়ে পাখা নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত—কিন্তু অষ্টমীর দিনেই এই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অনুরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার গুরুপুত্রকে দুইটাকা নগদ দিয়া কেবল একদিনের জন্য এই পুতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্সসমেত পুতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেক দিন তাহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল, তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পূজার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন, যে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে-কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তা'র মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না একথা বিনা উপদেশ বাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিল, আর বেশী পড়াশুনার দরকার নাই এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়কর্ম্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক্।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "সে তো ঠিক কথা বাবা। কলিকাতায় তো যাইতেই হইবে।"

কালীপদ কহিল, "আমার জন্যে কোন খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্ম্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মত বিষয়সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে-কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।"—কিন্তু পুরুষানুক্রমে কোন দিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে! বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মত ভয় করেন। কালীপদর মত বালককে একলা মাত্র কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাব কি করিয়া কাহারও মাথায় আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্য্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, "কালীপদ একদিন উকীল হইয়া সেই উইলচুরি ফাঁকির শোধ দিবে নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন—অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

একথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছায় বাঁধা পুরানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল

না। কেননা তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন—কালীপদর কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেম্‌নি খুব বড় করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন; এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন—এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে—সংসার খরচ হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্ব্বাদের মত সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনদিন খরচ করিবে না এই সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

৩

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চষমা আর নামিতে চায় না। কোনদিন এবং কোনপুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোন সংবাদই তাহার অগোচর নাই—এমন কি, হুগলীর কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর একটা পুল বাঁধা হইতেছে এ-সমস্ত বড় বড় খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র!—শুনেছো ভায়া গঙ্গার উপর আর একটা যে পুল বাঁধা হ'চ্ছে—আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি তা'তে সমস্ত খবর লিখেছে!—বলিয়া চষমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভালো করিয়া মুছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন।

—দেখ্‌চো ভায়া! কালে কালে কতোই যে কি হবে তা'র ঠিকানা নেই। শেষকালে ধূলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর শেয়ালগুলোও পার হ'য়ে যাবে, কলিতে এতো ঘট্‌ল হে!—গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড় একটা জয়বার্ত্তা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ-খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে সেই আনন্দে তিনি বর্ত্তমান যুগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি ব'লে দিচ্চি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই!"—মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন গঙ্গা যখনই যাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে-খবরটা সর্ব্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এদিকে কলিকাতায় কালীপদ বহুকষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনমতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য্য ঘটনা উপলক্ষে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পাড়লেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোন উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলায় একটি অব্যবহার্য্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়তে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সুবিধা এই যে সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না সুতরাং যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না, তবু পড়াশুনা অবাধে চলিত। যেমনই হউক সুবিধা অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু

সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড় মানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক—তবু সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ী হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল—সে তাহাতে কোনমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালোবাসে—কিন্তু আত্মীয়দের মুস্কিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়;—কাহারো সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারো সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এই জন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস্। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলি বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল সে লোক ভালো; যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভালো লোক হইবার কোন দরকার করে না। অহঙ্কার জিনিষটা হাতিঘোড়ার মত নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল—এইজন্য আপনার অহঙ্কারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনাখরচে চরিয়া খাইতে দিত না;—দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালোবাসিত। কিন্তু এত ভালোবাসিত যে যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড় ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার দেখানো, পাঁঠা খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্ব্বদা মনে করিয়া না রাখা তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মুগ্ধ যুবক পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধূর মনোহরণের উপযোগী সৌখীন সাবান এবং এসেন্স, আর তারি সঙ্গে এক আধখানি হালের আমদানি বিলাতী ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সুরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, তোমাকেই কিন্তু ভাই পছন্দ করিয়া দিতে হইবে—দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিষ বাছিয়া তুলিত;—তখন শৈলেন তাহাকে ভৎসনা করিয়া বলিত—আরে ছি ছি, তোমার কি রকম্ পছন্দ!—বলিয়া সব চেয়ে সৌখীন জিনিষটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, হাঁ ইনি জিনিষ চেনেন বটে!—খরিদ্দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিৎকর ভারটা নিজেই লইত—অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতে কর্ণপাত করিত না।

এম্নি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারিদিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার সখ তাহার এতই প্রবল!

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাঁৎসেঁতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া একখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুলিতে দুলিতে পড়া মুখস্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারসিপ্ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদ-

প্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে—কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁসে নাই—এবং যদিও সে জানিত, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুরূহ সমস্যা একমুহূর্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে তবু কোন কঠিন সঙ্কটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরীব হইয়া তবু দূরে থাকিবে শৈলেন এই অহঙ্কারটা কোন মতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়চোপড় এবং মশারি বিছানা যখনি দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনি সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো; এবং সে দুই সন্ধ্যা যথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই সকল অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুই একটি লোক এই নিভৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য দুইচারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু এই মুখচোরা মানুষের মুখ তাহারা খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যরূপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবলসমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ ও সবেগে গানবাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদীঘিতে এক গাছের তলে

বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতি পরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথাধরার ব্যামো উপসর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত তিন চারিদিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত এ-সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা কলিকাতা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন কলিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড় আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্ব্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলি দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া সকলের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোন-দিন বা সে দেখিল তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার একপাটির পরিবর্ত্তে একটি অতি উত্তম বিলাতী জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ-সম্বন্ধে কোন নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতামেরামৎওয়ালা মুচির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেস্‌টা লইয়া

আসিয়াছেন? আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।”—কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, “আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।”—“এই যে, এইখানেই আছে” বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল এফ-এ পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস্ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধূম করিয়া সরস্বতীপূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এবৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই—যাহাদের প্রায় নিত্যঅনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানিনা সে কি মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এপর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা তো আমাদের অগোচর নাই তবে উহার এত বড়াই কিসের? ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়!

সরস্বতীপূজা ধূম করিয়া হইল—কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোন ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু কালীপদর পক্ষে সে-কথা বলা চলে না। পরের বাড়ীতে তাহাকে খাইতে হইত—সকল দিন সময়মত আহার জুটিত না। তা ছাড়া পাকশালার ভৃত্যেরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালোমন্দ কমিবেশি সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সঙ্গতিটুকু গাঁদাফুলের শুষ্ক স্তূপের সঙ্গে বিসর্জ্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল

করিল না বটে কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সঙ্কোচ করিয়া তাহাকে আরো একটি টুইশনির যোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব-সত্ত্বেও বিনাভাড়ায় বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ-মেসে আর আসিবে না। কিন্তু যথা-সময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেককাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল—এবং একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা মস্তপুটুলিসমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শিয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদপ্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পুটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা আম কুল চাল্‌তা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত তাহার অবর্ত্তমানে কৌতুক-পরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর কোন ভাবনা ছিল না কেবল তাহার বড় সঙ্কোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোন স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিষগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত—কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রাম্যঘরের আদরের ধন,—যে আধারে সেগুলি রক্ষিত, সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও সহরের ঐশ্বর্য্যসজ্জার কোন লক্ষণ নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে—কিন্তু এইগুলিকে কোন সহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে—ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসহ্য। আগের বারে তাহার এই সমস্ত বিশেষ জিনিষগুলিকে তক্তপোষের নীচে পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচমিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, ধনরত্ন তো বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে—একেবারে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অফ্‌ বেঙ্গল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়নাকোট্‌টার লোভ

সামলাইতে না পারি। ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোছের নূতন কোর্ট কিনিয়া না দিলে তো কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমাত্র কোর্ট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে।

শৈলেন কোনদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালিখসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা মিট্‌মিটে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়ুশূন্য বদ্ধ ঘরে কালীপদ গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, "এবারে কালীপদ কোন্‌ সাতরাজার ধন মাণিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির কর।"—এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্পদামের তালা—তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে—প্রায় সকল চাবিতেই এ-তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকাশে জন দুই তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তপোষের নীচে হইতে আচার চাট্‌নি আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাণ্ডগুলিকে আবিষ্কার করিল। সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিংসমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিয়া টিনের বাক্সটি খুলিতেই কয়েকটা ময়লা কাপড়, বই, খাতা, কাঁচি ছুরি, কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে সমস্ত কাপড়চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কি পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর একটি প্রায় তিনচার খানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া আর কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল এই নোটখানারই জন্যে

কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোন লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদ-প্রত্যাশী সহচরগুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল রাস্তায় কালীপদর মত যেন কাহার কাশি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয় তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল দেখা যাক্ এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কি-রকম কাণ্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্ত দেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তপোষের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল হয় তো সে চাবিবন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড় সমস্ত উলট্‌পালট। তাহার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিষপত্র বাহির করিয়া দেখিল তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলা আছে। বার বার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এদিকে উপরের তলার দুই একটি করিয়া লোক যেন আপনার কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোন আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিষপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তখন সে বিছানার

উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মত পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোটখানি—জীবনের কত মুহূর্ত্তকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত আবর্ত্তমান দুঃখের সঙ্গী করিয়া লইলেন সেদিনকার মত এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব চেয়ে যে বড় বাণী, যে মহত্তম আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়াছিল। সেই তাহার মাতার অতলস্পর্শ স্নেহসমুদ্রমন্থন-করা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মত মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে—এও সেই রকম।

উপরের তলার অট্টহাস্য শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল এ চোরের কাজ নয়;—একমুহূর্ত্তে সে বুঝিতে পারিল শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ধনমদগর্ব্বিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনো সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথাধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার—কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না। কাঠের ছাদওয়ালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহবা চৌকিতে, কেহবা বেতের মোড়ায় বসিয়া, হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিল—"দিন্ আমার নোট্ দিন্!"

যদি সে মিনতির সুরে বলিত, তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু

উন্মত্তবৎ ক্রুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত ক্ষাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বলেন মশায়! কিসের নোট!"

কালীপদ কহিল, "আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।"

"এতবড় কথা! আমাদের চোর ব'ল্‌তে চান্!"

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্ত্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চার পাঁচজনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাঘের মত গুম্‌রাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোন শক্তি নাই—কোন প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔদ্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে-রাত্রি যে কলাপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা একশোটাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—"দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসগে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হ'য়েছো! তেজটুকু আগে মরুক্—আমাদের সকলের কাছে একটা রিটন্ অ্যাপলজি আগে দিক্ তা'র পরে বিবেচনা ক'রে দেখা যাবে।"

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল—ভাবিল, হয় তো উকীল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোন সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইল। কালীপদ কি যে বকিতেছে ভাল বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে "বাবা" "বাবা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয় তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাবু।" কেহ কোন সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়্‌বিড়্‌ বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল —"কালীপদবাবু, দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। সে বলিল, "দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক্।"—কেহ কেহ পরামর্শ দিল, পুলিশ ডাকিয়া আন—কি জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে—কাল যে-রকম কাণ্ড দেখিয়াছি—সাহস হয় না।

শৈলেন কহিল, "না, শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আন।" অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন—"এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল—তক্তাপোষের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া—তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে—তাহার রক্তবর্ণ চোখ দুটা খোলা এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া-পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার আত্মীয় কেহ আছে ?"

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বলুন দেখি ?"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।"

শৈলেন কহিল, "ইহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই—আত্মীয়ের খবর কিছুই জানিনা। সন্ধান করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে কি করা কর্ত্তব্য ?"

ডাক্তার কহিলেন, "এ-ঘর হইতে রোগীকে এখনি দোতলার ভালো ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।"

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত—প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুই তাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতি যত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি—আর একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চম্‌কিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয় আনী! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্ম্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী।

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল তাহার মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে-কথাটা তাহার শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্য সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে-কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন—শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, একথা সে জানিত। তাহার পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ? এই তাহার খুড়া?

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত পরমস্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোট—তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ তৃষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন—ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালোমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস্—আমার শ্বশুর তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।—তাঁহার ছেলেরা এসব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল সে-ও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানী-চরণের উপরেও তাঁহার ভারি রাগ হইত। বর্ত্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না—কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভনসত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্ত্তী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

৪

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদেব মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতি যত্নে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কষ্টসঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো যেন

অযত্ন না হয়। যদি তেমন বোঝো আমাকে খবর দিলেই আমি যাবো।”—চৌধুরীবাড়ির বধূর পক্ষে হট্‌হট্‌ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসঙ্গত যে প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিত না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্য্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাষ্টার মশায় বলিয়া ডাকিল—ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে “বাবা” “বাবা” বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল—তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন—“এই যে বাবা, এই যে আমি এসেছি।”—কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, “জ্বর পূর্ব্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয় তো এবার ভালোর দিকে যাইবে। কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না একথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড় হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে—সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোকমুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—সে-বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে; এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালো শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে এ-কথা কে বলিবে! বিশেষত কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যে রকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এই প্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কি আর সহবৎই বা কি!

জ্বর কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চম্‌কিয়া উঠিল, ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা সহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর! মনে হইল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!

তখন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কি করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইবে সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

একসময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে কি না! প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি আমাকে মাপ করুন।"

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল এই যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সঙ্কোচে কোন দিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত— যদি বন্ধুর মত ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত তবে সে কত খুসিই হইত—কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি দিয়া

যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত, যখন তাহার সৌখীন চাদরের স্নগন্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তারেখাহীন তরুণ মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্ত্তে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাঁৎসেঁতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্য্যলোকের ঐশ্বর্য্য-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দ্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সুন্দর মুখের দিকে কালীপদ আর একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না—আস্তে আস্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল—ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাসা চলে। তাহাদের উভয়পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকৃরুণদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকৃরুণদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে একথা আজ সে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড় একটি গভীর আনন্দ হইল! তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায় যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল আহা মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুক-পরায়ণ সুন্দর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্নকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দপ্রবাহে মাঝে মাঝে বড় বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের

একটা অভিমান ছিল—কোন এক সময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল একথা লইয়া বৃথা গর্ব্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। আমরা গরিব, এ-কথাটাকে কোনো "কিন্তু" দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের দিনের কথা গর্ব্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু সে যে তাঁহার সুখের দিন ছিল—তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎসমূর্ত্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমস্নেহশালিনী ভ্রাতৃযায়া রমাসুন্দরী, যখন তাঁহাদের সংসারের গৃহিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কি অজস্র আদরই তাঁহারা লুঠিয়াছিলেন—সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু এই সমস্ত সুখস্মৃতি আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া যাইবে এ-সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই—তাঁহার সতীসাধ্বী মার কথা কখনই ব্যর্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগ্‌লামিমাত্র। তাহারা মায়ে ছেলেয় এই পাগ্‌লামিকে আপোসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।—কিন্তু এরূপ তর্কে উল্টা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন কি, সে-ও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন—কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারো কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পাড়তে জানিতেন—তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং

অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সাম্‌নেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেম্‌নি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কি! কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত—তা বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তা'রা তো তোমারি ছেলেরই মত, তা'রা তো তোমারি ভাইপো। সে-সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে—ইহাই কি কম সুখের কথা! শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত—শৈলেন হয় তো তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ নাই একথা কোনমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়ই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল! তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন একথা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈত্রিক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় আছে সে-কথাও সে কোনো মতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ্ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোন সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলারশিপ ফস্‌কাইয়া গিয়াছে আর তো সেরূপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল—এসম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও—সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।

শৈলেন বলিল, এখন আপনি গেলে কোন ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার

কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে দু'দিনেই সারিয়া যাইবে। আর আমরা তো আছি।

ভবানীচরণ কহিলেন—সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না; তবু মন মানে কই ভাই! বিশেষত তোমার ঠাকুরুণদিদি যখন যেটি ধরেন সে তো আর ছাড়াইবার জো নাই।

শৈলেন হাসিয়া কহিল—"ঠাকুর্দ্দা তুমিই তো আদর দিয়া ঠাকুরুণদিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।"

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যখন নাৎবৌ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কি-রকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।"

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলিকাতার নানাপ্রকার আরাম আয়োজনও রাসমণির আদর যত্নের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড় বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকাল বেলায় জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখ চোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা যেন আগুনের মত গরম;—কাল অর্দ্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমিষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্ব্বলতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেখ ঠাকুর্দ্দা, তোমারও কষ্ট হইতেছে রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকুরুণদিদিকে আনানো যাক্।"

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক্ একটা প্রকাণ্ড ভয় আসিয়া ভবানীচরণের

মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত পা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যেমন ভালো বুঝ তাই কর।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টামাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই ধ্বনিগুলি তাহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না—তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল—স্বামীর মধ্যে আবার দুই জনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল আর আমার সয় না। তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

৫

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুম হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে "দয়াময় হরি" বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়া-শুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোষের উপর পাতা আছে, তাহার নানাস্থানে এখনো সেই কালীর দাগ রহিয়াছে; মলিন দেওয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোষের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড রয়্যাল রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়—তা'র ছেলে-বয়সের ছোট পায়ের এক পাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়াছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ

তাহা সকলের চেয়ে বড় হইয়া চোখে দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোট জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোষের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শুষ্কচোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেমন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন!

অন্ধকার রাত্রি—টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীর বেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সাম্‌নে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকালতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে—তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময় পূজার সময় কলেজের ছুটি হয় কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনো দিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল কিন্তু জগৎ সংসারে সে এই বৃদ্ধকে কি একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল! বাহিরে বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল।

এমন সময়ে অন্ধকারে ঘাস-পাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল! ভবানীচরণের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। যাহা কোনমতেই আশা করিবার নহে তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে —ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সাম্‌নে আসিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে—তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু সে যেন মাথায় কালীপদরই মত হইবে। "এসেছিস

বাপ্‌”—বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলায় একবার “কালীপদ” বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহাল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল গরাদের সাম্‌নেই ঘরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাঁধা একটা কি পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন একটা পুরাতন দলিলের মত। চষমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—“ও কিও?”

ভবানীচরণ কহিলেন—“সেই উইল।”

রাসমণি কহিলেন—“কে দিল?”

ভবানীচরণ কহিলেন—“কালরাত্রে সে আসিয়াছিল—সে দিয়া গেছে।”

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ কি হইবে?”

ভবানীচরণ কহিলেন—“আর আমার কোনো দরকার নাই।” বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ-সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল—“আমি বলি নাই, কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে?”

রামচরণ মুদি কহিল—“কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এষ্টেশনে পৌঁছিল তখন একটি সুন্দর দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তা’র হাতে যেন কি একটা দেখিয়াছিলাম।—”

“আরে দুর” বলিয়া এ-কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

[ ১৩১৮—আশ্বিন ]

———

# পণরক্ষা

১

বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মা'ও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে ষোল বছরের ছোট। মাঝে যে কয়টি ভাইবোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া, যখন রসিকের এক বছর বয়স, তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে একদল দৈত্য আসিয়া বেচারার তাঁতের উপর অগ্নিবান হানিল এবং

তাঁতীর ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না—ঠুক্‌ঠাক্ ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে—কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চল লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সুবিধা ছিল। থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় সৌখীন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সে-জন্য তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড় বেশি তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্যই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পূজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনকেই খর্ব্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিনশো টাকা পণ এবং অলঙ্কার বাবদ আর একশো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে, কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স সবে চার—এখনো অন্ততঃ চার পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোষ্ঠিতে তাহার সঞ্চয়ের স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শুভগ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোট ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দ্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতাকর্ত্তৃক বঞ্চিত হতভাগ্যদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ

আছে। তাহার কাছে ঘেঁসিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে—সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের সৌখীনতাই পাড়ার ছেলেদের মনমুগ্ধ করিয়াছে এ-কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্ব্বসংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনৈপুণ্যের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্য্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা কিছুতেই সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভালো লাগিত না—তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্যসাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল—তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটো বৎসর পাড়ায় কালীপূজায় উৎসবকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল; তৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না—রসিক তখন চাপকান-জোব্বাপরা মেডেল-ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স হার্ম্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালী লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরো বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলি ভাবিত, এমন আশ্চর্য্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এখন কোনমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতর ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্যনূতন সখ মিটাইতে গেলে ভাবীবধূ

কেবলি দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স তখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশত পুরিল না এবং সেই মেয়েটি যখন অন্যত্র শ্বশুরঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল, আমার আর বড় আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।

পাড়ায় যদি স্বয়ম্বর প্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, ননী, শশী, সুধা—এমন কত নাম করিব—সবাই রসিককে ভালোবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্ত্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সৌরভী, সে বড় শান্ত—সে চুপ্ করিয়া বসিয়া পুতুলগড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজনমত রসিককে কাদাকাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা কিছু ফরমাস করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পাণ চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্ত্তিগুলি তাহার সাম্নে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত, সৈরি, তুই এর কোন্‌টা নিবি বল্—তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুসি লইতে পারিত, কিন্তু সঙ্কোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমত জিনিষটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুলগড়ার পর্ব্ব শেষ হইলে যখন হার্ম্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত—রসিক তাহাদের সকলকেই হুঙ্কার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোন উৎপাত করিত না—সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া বামহাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ্ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ। সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগ ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিষ লইবার জন্য

তাহাকে কোনোদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাস করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নূতনগোছের যাহা কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারো আবদার বড় সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে ঠিক করিল এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়—পাঁচশো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁতবোনায় সাহায্য করিতে ডাকে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রসিক ভাবিত, দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে! আমি হইলে তো মরিয়া গেলেও পারিতাম না। তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধূ আনিবার জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জ্বালা হইয়াছে, বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষার্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মত কেবলি জাগিয়া আছে।

তবু যথেষ্ট দ্রুতবেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরো বেশি দূরবর্তী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমানবেগে চলিতে চায় না, বারবার ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, কেবল নিশা নিশাচরীর চৌকিদারের মত প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনো মিটমিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দই, আর একটু হাতে টাকা জমুক্, আস্‌চে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে। সুবিধামত বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেঁকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না তুমি আমার কাজে যোগ দাও।" রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভৎসনা করিল; কহিল, "বাপপিতামহের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কি?"

কথাটা অসঙ্গত নহে এবং ইহাকে কটূক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল এত বড় অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড় একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ভাঙা উঁচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রসিক আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে —গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাস্‌ করিয়া এক চড় কসাইয়া দিল। কখন

তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে এমন সময়ে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস্?" সৌরভী খুসি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়কি আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্নে দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরো বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা ইহা তো ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্ত্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বভাবপটু রসিকের হাত দুরস্ত হইবার দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দুরস্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমানুষটির মত তাহাদের বাপ পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু সেরূপ ফল তো দেখা গেল না। "দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!" সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমন পরিবর্ত্তন হইল যে সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না—সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কি জানি এই ছোট শান্ত মেয়েটির ভারি

কান্না পাইতে লাগিল। হার্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, সে তো ঘুচিয়াই গেল—তা'র পর সর্ব্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাস খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দীঘি, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া হাট, বাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার ক'রয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেথানে খুসি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছু না কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবন-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহু দূরের জন্য তাহার চিত্ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল—বংশী তাহাকে খুব বেশীক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু ঐ একটুকুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্য্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল;—এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

২

এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের একছেলে এক বাইসিক্‌ল্‌ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিন্তু কি চমৎকার, কি স্বাধীনতা, কি আনন্দ। দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্রের মত অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মত মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ মহাভারতের সময় মানুষে

কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত—এ যেন সেই রকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিক্‌ল্‌ নহিলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কি বেশি? একশো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা তো সস্তা! বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্য্যের অরুণসারথি তো সৃষ্টিকর্ত্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিক্‌লটি আপন পৃথিবীজয়ী গতিবেগ স্তব্ধ করিয়া কেবল একশো পঁচিশ টাকার জন্যে দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস্‌ দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর কিছু চাইবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে, চাওয়াটার কিছু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। কহিল —"আমাকে একশো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।"

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মুহূর্ত্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, দূর হোক্‌ গে ছাই, এমন করিয়া আর টানাটানি করা যায় না—দিয়া ফেলি। কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! একশো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কি! ধার! রসিক একশো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে! তাহ যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করিয়া বলিল, "সে কি হয়, একশো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব!" রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, "এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।" বংশীর কানে যখন সে-কথা গেল তখন সে বলিল, "এও তো মজা মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।"

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর হইল। জিজ্ঞাসা

করিলে বলে, আমার অসুখ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহারে বিহারে অসুখের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, "থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না"—বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতীদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর বাহনের মত সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতীর ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহূর্ত্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে;—এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে কেবলি কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্ম্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্ব্বে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙ্গিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্লান্তদেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল—"তোমার অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই তোমার সামর্থ্য যতদুর ঢের দেখিয়াছি! শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবী করিলেই তো হয় না!" বলিয়া সে চলিয়া গেল—আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলের একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে, যতগুলি গৎ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—এমন সময় সঙ্গীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্য রকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্য্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতর মর্ম্মান্তিক ভর্ৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল—তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী এই কথা কেবলি তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে দাদা শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাঁতের সূতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা হাত বাড়াইবামাত্র সে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিত সে-সমস্তই সুস্পষ্ট, মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার কয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্ম্মো-নিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকার দাওয়ায় রসিক চুপ্ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মত সরু লম্বা এক থলি খুলিয়া ফেলিল; রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কহিল, এই নে ভাই—আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বৌ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার,—আমার সে শক্তি নাই—তুই চাকার গাড়ি কিনিস্, তোর যা খুসি তাই করিস্।” রসিক

দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বৌ আনিতে হয় আমার নিজের টাকায় করিব তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না।" বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোন কথা বলাই অসম্ভব হইয়া পড়িল।

৩

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সাম্‌নে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায় আগেকার মত তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর সৌরভীর তো কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মত আড়ি—অথচ সে যে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর আড়ি করিয়াছে সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া আপন মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি!"

হার্মোনিয়ম! এত বড় দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব! কিন্তু যে জিনিষটা তাহার ভালো লাগে, বাধা না পাইলে সেটা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাখিল "ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।"

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরো একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল—"সৈরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আন্ তো।"

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে তাহার সময় নাই।"—রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, "চল্ দেখি সে কোথায় বড়ি শুকাইতেছে।" রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "রাগ করেছিস্ সৈরি?"—সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সুতা মিলাইয়া নানা চিত্র বিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা শেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা শেলাই করিত তাহার কতকগুলা বাঁধা নক্সা ছিল—কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই শেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত—সে মনে করিত জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য্য কাঁথা আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল—এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায় কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, "সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখ্‌বি না?"

অনেক কষ্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া?

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পাণ আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা

আঙিনার উপর মেলিয়া দিল—সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল, "সৈরি, এ কাঁথা তোর জন্যেই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম"—তখন এত বড় অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিষ দাবী করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না;—সে মনে করিল, লোভনায় জিনিষ লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ কালব্যয় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিযা লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার পূর্ব্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে দুটি বালকবালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতই ভাব করিয়া লইল—কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি রান্না হইবে"—বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল, "আমার শরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছু খাইব না—রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।"—স্ত্রীলোকটি বলিল, "রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে খাইবে না—অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে।"—শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্য্যন্ত মুড়িয়া পাস ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এম্নি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন; গরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁসঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ

হইয়া আছে।—রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না, তখন রসিকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। উপার্জ্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই, যেমন করিয়া হৌক্ এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিকেলে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না—রহিল এখানে চন্দনীদহের ঘাট; এখানকার সুখসাগর দীঘি, এখানকার ফাল্গুন মাসে শর্ষে ক্ষেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব, এখানকার আমোদ উৎসব,—এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

৪

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত আর সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল একবার তাহার সঙ্কীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালব্যয় আছে তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে—যেমন মনে হয় আধঘণ্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়—গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেম্‌নি সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে; কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। যখন দর্শকের মত দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু যখন সে ভিতরে প্রবেশ করিল মজা তখন বাহির হইয়া

আসিল। যাহা আমোদের জিনিষ যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মত অরুচিকর জিনিষ আর কিছুই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ির স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে যে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে, মুহূর্ত্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে; এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীতশীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে,—দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনই সেই অর্দ্ধরাত্রে সে মনে করে কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে; মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, আমি পণের টাকা ভর্ত্তি করিয়া বাইসিকেলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবে আমি পুরুষ মানুষ, তবে আমার নাম রসিক।

একদিন দলের কর্ত্তা তাহাকে তাঁতী বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেই দিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালা বাটি, নিজের যে কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্ত্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবী যথার্থ এই পশুপক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন—আর মানুষ বুঝি তাঁর কোন্ সতীনের ছেলে, তাই চারিদিকে এত বড় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে,

কোথাও রসিকের জন্য এক মুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চালিয়াছে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—বোধ কবি তাহার মনে হইতেছিল দুর্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি!

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগ্‌ড়ি পরা —দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে—কিন্তু মুটে মজুরের মত কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশী কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই—সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল যেন মুক্তি পাইলাম। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মত যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি কবিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল আজ তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না—আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, "আমি তাঁতীর

ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান।”

“আমি তাঁতী” আগে হইলে রসিক একথা কখনই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না—তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ তো লাফাইয়া উঠিল—বলিল, “তুমি তাঁতী! আমি তো তাঁতী খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।”

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসাখরচবাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিক্‌ল চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধূর বরমাল্যের তো কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেম্‌নি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে; তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানাপ্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্‌ আবর্জ্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের সাম্‌নে সে কেবলি আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সাম্‌নে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধপাগ্‌লা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিল বর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মত প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিনদিকে আমন ধান, এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছ ধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁসের খোঁটা পোঁতা, তাহারি উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্ত্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্ত্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময়

পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তা'রই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের খুঁটে পাণ বাঁধা বড় বড় স্নিগ্ধ চোখ মেলা সৌরভী; এই সমস্ত স্মৃতি, ছবিতে গন্ধে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান বাজারের কলের তৈরি জিনিষ হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলের কাজ কাজের বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মত মরণের পথে টানিয়াছিল—কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এই জন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা টেঁকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসরের ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলি তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেই দিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁসঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা, তোর বর আসিয়াছে বলিয়া সৌরভীকে ক্ষ্যাপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলি বাঁসের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা

তাহার নাই এইটেই তার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড় দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

৫

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না;—কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেম্‌নি মেঘ দেখা দেয় অম্‌নি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেই রকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কি একটা খবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সাম্‌নে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের সঙ্গে তাহার দুই চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনেই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দী বাবুদের মস্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিসন্‌ এজেন্সির মস্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জানকী বাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সে রকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবারই দরকার হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে অতএব জানকী বাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূলকারণ সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার শুভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্তবিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকী বাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ ছিল হরমোহন; তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই কমিসন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য—তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় নূতন যৌবনে সমাজসংস্কারসম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড় বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায়সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে—তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাঁহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুয়োরাণীর মত তাঁহার বক্ষের পার্শ্বে টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহার তহবীল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল—অল্প বয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁর রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনি তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনি তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে—কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের বসাক বংশের ছেলে—তাহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম

সকলেই জানে—এখন তাহাদের অবস্থা হীন কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছেলেটির পড়াশুনা কি রকম?"—জানকীবাবু বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি, তাহাকে হিন্দুয়ানিতে আঁটিয়া উঠা শক্ত।" গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"টাকাকড়ি?" জানকীবাবু বলিলেন, "যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।" গৃহিণী কহিলেন, "আত্মীয় স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে" জানকীবাবু কহিলেন, "পূর্ব্বে অনেকবার সে পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়জনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।"

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে—এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সত্বর টাকা জমাইবার কি উপায় হইতে পাবে তাহা ভাবিয়া কোন কুলকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না!

জানকী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?" রসিক কহিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই!"—সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে, অকর্ম্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কি রকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোন ত্রুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকল প্রকার দানসামগ্রীর আগে একটা বাইসিক্‌ল্ দাবী করিল।

৬

তখন মাঘের শেষ। শর্ষে এবং তিসির ক্ষেতে ফল ধরিতেছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের

প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোরুমহিষের দল লইয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল কমিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে;—শার্টের উপরে বোতামখোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙীন ফুলমোজা ও চক্চকে কালো চাম্ড়ার সৌখীন বিলাতীজুতা। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিক্‌ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্যলোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্ব্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মুহূর্ত্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল,—ছেলেরা সেইদিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাইসিক্‌ল্ রসিকদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে—কেহ নাই—কেহ নাই। এক নিমিষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া আসিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল; কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছিল, তাহা যেন বহুদূরের কোন্ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিদায়ের বার্ত্তা বহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সামনে যাহা কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রুদ্ধ কপাট, এই জিয়েল গাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজুর গাছ—সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত্র, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশু মুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল, গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নীচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল—"বুঝেছি, বুঝেছি—দাদা নাই!" অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, "ভাই রসিক দাদা, চল আমাদের বাড়ি চল।" রসিক তাহার দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সাম্‌নে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত, কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মুহূর্ত্তকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কি একটা জিনিষ অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে। প্রাঙ্গণে লোক সমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিল এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি নূতন বাইসিক্‌ল্। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুকফাটা কান্না বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার এক মুহূর্ত্ত আর কোনো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্যস্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনই যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌লটি ভি, পি, ডাকে পাইল সেই দিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল;—গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, "আর একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো—দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল—বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটী বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে, কিন্তু হায়, কলিকাতা সহরে টাকার হাড়কাটে চিরকালের মত সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

[ ১৩১৮—পৌষ ]

---

# হালদার-গোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনো রকমের গোল বাধিবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেন না, সঙ্গত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মত হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোন ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে;—গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কিনা জানিনা, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসঙ্গতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুইকূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল,—যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটি সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য মানুষ

যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের ষ্টীমের মত তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে। সাম্নে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়মানুষি চাল। যে সমাজ তাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এই প্রকার লোকেরা বিনাচেষ্টায় আপনার কাছে অন্তত দুটি একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মত টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায়, যে লোক নিজের ভার ষোলো আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না, কিন্তু আর একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা তাহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মান বৃদ্ধি করা ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন এক প্রকারের পুরুষ মা, তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহরক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মত হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়ত মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু

এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদ-পরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকঙ্কালের উপর কোনো প্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্ত্তিমান দুর্ভিক্ষের মত পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেকদিন হইতে বাধিয়াছে। মনে কর, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়-বৌয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিষটা ফরমাস করে। কিন্তু সে হইবার জো নাই। খরচ পত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মত হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই যে-সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ দশটাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই—একথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো না কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতা-বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায় মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব

প্রবলভাবে বর্ত্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার বয়স যতই হউক্ চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়-বৌয়ের যেমনতর গিন্নিবান্নিধরণের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড় স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়ন শাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষনতা আছে তাঁহারা জানেন বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড় কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আব্দার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত;—নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জ্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছে হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুসি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাস করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছুনা-কিছু খর্ব্ব করা সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দরকষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুসি হইল তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে বেশ ভালো;—কিন্তু বনোয়ারির মনের খট্‌কা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়ত পছন্দ হয় নাই; কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলে—"তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঁৎখুঁৎ ক'রচ? কেন, এ তো বেশ হ'য়েচে!"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে—সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎগুণ। কিন্তু স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে

কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সে-ও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না—যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর কিছু না-ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন ময়ূরের পুচ্ছের মত স্ত্রীর কাছে—সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়বাবু তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর কিছুর জন্য তত নহে, যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মত শর যোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধন সম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙীন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষারসঙ্ঘাতের মত;—তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনি যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান সখ তিনটি,—কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃত-চর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদ্‌লার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিণা হাওয়ায় সেগুলি বড় কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির অলঙ্কার বাহুল্যকে খর্ব্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক্ কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন

তাহার ভয়ে লোক অস্থির। কিন্তু এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহাব ছোট ভাই বংশীলাল যখন ছোট ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তার সঙ্গে এই জিনিষটিও জড়িত,—এই লালন করিবার ইচ্ছা! কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতই ছোট—ছোট বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনেভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড় আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানা রকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই সখ কোনো-মতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্য্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এম্‌নি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্য্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী তাহার ভরা যৌবন,—সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মত হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্ত্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই বছর কয়েক পূর্ব্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার প্রয়োজন উপলক্ষ্যে অন্যান্য বারের মত জেলেরা মিলিয়া একযোগে খত লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমত মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্রও করে না। সে বছর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বছর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু মধুকৈবর্ত্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো

নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে একথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক্, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এই জন্য কিরণ সুখদাকে বারবার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কি ক'র্‌ব বল! জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্ত্তা আছেন মধুকে বল তাঁকে গিয়ে ধরুক্।"

সে চেষ্টা তো পূর্ব্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের উপরই অর্পণ করেন, কথনই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপিল করিতে চায় তাহা হইলে কর্ত্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন—বিষয়কর্ম্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কি!

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বারবার করিয়া বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাকার গুমট ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগ্‌লা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির;—বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে! আর আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে—যেন ঠেলাঠেলি ভিড়। জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানে রংকরা

একখানি সাড়ি এবং খোঁপায় বেল ফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতীর চিরনিয়ম অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুনঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে রঙীন চাদর ও বেলফুলের গড়ে' মালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড় কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? মধুকৈবর্ত্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে?

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্ত্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গালি দিতে লাগিল। বলিল, ছোটলোক,—নীলকণ্ঠ কহিল, ছোটলোক না হইলে বড় লোকের শরণাপন্ন হইব কেন। বলিল, চোর,—নীলকণ্ঠ বলিল, সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়। সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল—শেষকালে বলিল, উকিল-বাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।

বনোয়ারি ছোট ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনি বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত একলা গেলে কোনো ফল হইবে না—কেন না, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্ব্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাঁহার বড় ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু এখন মনে হয় বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এই জন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে-ই কেবল দুটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার

জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিন রাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে;—দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস্!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ্ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায় —সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী বলিয়া খুব এক চোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দীঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্‌ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিষ্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্ত্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া সুরু করিয়া দিল নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল

নীলকণ্ঠের সৎস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্ত্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু সে জন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ আবহমানকাল এম্‌নি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়-ঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই মনিবের বিষয় রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারীর কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কি করে, না করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "দেখ দেখি বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে, ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মত।"

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দীঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্দ্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া আছে। কাজকর্ম্ম আজ সে সকাল সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধু-কৈবর্ত্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড় ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড় হইতে হইবে এমন কথা কোনো দিন তাহার মনেও হয় নাই। ইঁহারা যে গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্ম্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্ত্তকে আমি রক্ষা করিব!"—কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোন একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া?"

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোনো দিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামী হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু গ্রামে এ-সব জিনিষের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারিদিকে লোকে কানাকানি করিবে। এই জন্য কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্ত্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কি রে কি, ব্যাপার-খানা কি!" স্বরূপ বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্ব্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।

কি সর্ব্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর

দিল। পুলিস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ্য করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিষ্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নূতন-পাস-করা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্ত্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয়মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না।—আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিঁকিবে কি করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, তুই থাক্ তোর কোনো ভয় নাই। কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে—বোধ করি নিছক্ নিজের পৌরুষের স্পর্দ্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন কি কর্ত্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে। বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক্। এ কি কাণ্ড বাড়ির বড়বাবু—বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ! তা'র উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তা-ও এই এক সামান্য মধুকৈবর্ত্তকে লইয়া!

অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়বাবু জন্মিয়াছে এবং কোনো দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়-ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়বাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনো দিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়বাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড়-বৌয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লট্‌কানে রংয়ের সাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্ত্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদার বংশের বড় ছেলে সকল কথার আগে একথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সঙ্গত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড় ঘরের দাবী কি সামান্য দাবী! তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্ত্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য!

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না একথা বনোয়ারি কিছুতে বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়বাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল—অন্য কোনো প্রকারের উচিত অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্ত্তব্য তাহা সে-ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া ওঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর

খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, "এ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "জান তো ঠাকুরপো, তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার যদি ক্ষ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সাম্লাইতে পারে না। আমি কি করি বল তো?"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপা ফুলটির মত পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্ত্তব্যের কথাটা, চারিদিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য সত্যই একটা ক্ষ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জমাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এই জন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মত উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শাণ দেওয়া সুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক্ মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল— তাহার পরে আর কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিন মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয় স্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ্‌ করিয়া আছেন।

এম্‌নি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিশ তাহা জানে এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেত অমাবস্যা রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিত মত তাহার শান্তি হইল। কিন্তু সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্ব্বের মত রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালবাসিত, আজ দেখিল বংশী তাহার কেহ নহে; সে হালদার-গোষ্ঠীর। আর তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সে-ও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সে-ও হালদার-গোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাসে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়-বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমত মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁৎখুঁৎ করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদার-গোষ্ঠীর বড়-বউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায়রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবনের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা-শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধাবরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু এক-এক জনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মত কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সঙ্কীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে—নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক—কিন্তু যেদিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদার-গোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্ব্বের মত কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়,—আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্ত্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেন না, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে, তাহার মূল কারণ মধু। এই জন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি সে যে, সয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া-করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ-কথা বারবার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এম্‌নি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটো-বৌ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে—এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত কোল হইলে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখী শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এই জন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষ্যার বেদনা জন্মিয়াছিল কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্ম্যের একজন ভাড়াটে—যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার

আত্মবিসর্জ্জনের শক্তি যে কত প্রবল তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল,—এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভালো করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মানুষহিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল বংশী জ্বরে পড়িয়াছে, এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই, এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কি তাহা আর সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেই জন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্ব্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তান-সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকল প্রকার

অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা তাবিজ মাদুলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড় ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'বাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-দিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এই জন্য সকল প্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল;—প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্ত্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্ব্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্ব্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন—বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুইশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের একজিক্যুটর, তাহার উপরে ভার রহিল সে যতদিন বাঁচে হালদার পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সে-ই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা

পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো দুই মত নাই। অতএব তিনি বরাদ্দমত আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান। তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না—এ বাড়ি ছাড়িয়া চল আমার সঙ্গে কলিকাতায়!"

"ওমা! সে কি কথা! এ তো তোমারি বাপের বিষয়—আর হরিদাস তো তোমারি আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন?"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কি কঠিন! এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষ্যা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছেন কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদু, মধু, যত কৈবর্ত্ত এবং মুসলমান জোলার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিষপত্রের লিষ্ট করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক বাক্স আছে তাহাতে তালা চাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দ্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিষ বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বনোয়ারি সিংহগর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও!"

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, "বড়বাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই! কর্ত্তার উইল অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, দেখ একবার, ব্যাপারখানা দেখ! হরিদাস কি

আমাদের পর ? নিজের ছেলের সামগ্রী ভাগ করিতে আবার লজ্জা কিসের ? আর, জিনিষপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি ? আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে !

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্ত্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁস ছিল না যে কর্ত্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সর চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গী অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। নীলকণ্ঠ বলিল, কর্ত্তার শ্রাদ্ধসম্বন্ধে—

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল—"আমি তাহার কি জানি ?"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সেকি কথা। আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।"

মস্ত অধিকার! শ্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে—আমি আর কোনো কাজেরই না। বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, "যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাসা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে তাহার মত ভাগ্যকর্তৃক পরিহাসিত আর কে আছে! পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুয্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল এই দলিল দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক্।

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব!"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে!

বাহিরের বাগান পর্য্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটীরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে

ক্ষতি কি ছিল! তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মত সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোন কিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথী। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, গিয়াছিলাম বই কি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কি হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার রুমালে বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমানুষের মত কহিল, "আজ্ঞে না।"

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ! তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও!

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। কি জিনিষ তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, যে-করিয়া হউক্ এ কাগজগুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব। কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মত বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, "উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই!"

শ্রান্ত দেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কি হারাইয়াছে বল দেখি?"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল—হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কি দিবে?"

বনোয়ারির মনে হইল, হয় তো আর কিছু। সে বলিল, আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।—এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল, সে জানে তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙীন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল—সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন পূর্ব্বে সে তাহার এক নূতন কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে ল্যাজ নাড়িতেছে। আর কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কি চাস্ আমাকে বল্।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই জ্যাঠামশায়।"

বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল—"নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও—উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি হরিদাসের। বিষয় সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে পাইলে?"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে এই নে!—" বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই—কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদার-গোষ্ঠীর বড় বৌয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন, অমরু শতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না—দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্‌ ধিক্‌ করিতে লাগিল।

[ ১৩২১—বৈশাখ ]

# হৈমন্তী

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে সেই জন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি ; এফ, এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নর-মাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেম্‌নি ও বয়স যতই হউক স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা, সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্ব্বাদে পুনঃপুনঃ কাঁচা হইয়া উঠে আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্‌স্‌ট্‌বুক্‌ কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু এ কি করিতেছি? এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম? এমন সুরে আমার লেখা সুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম? মনে ছিল কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখ-সন্ধ্যায় ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কি? তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরের কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে,—আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী—দেশের প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিষ আমাদের সমাজে সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কীর পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। কোনটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড় কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর অন্তে এক এক বছর করিয়া বড় হইতেছে তাহা আমার শ্বশুরের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না, যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ,—এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক্ কিন্তু আমি বলিতেছি সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে

শিশিবের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়—একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙ্গিয়া !"

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাঁর চুল টানিয়া বাঁধিয়া খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কম্পানির জবড়জঙ্গ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিদে মুখ, সাদাসিধা একটি সাড়ি। কিন্তু সমস্তটি লইয়া কি যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না! যেমন-তেমন এক খানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা দাগকাটা শতরঞ্চ ঝোলানো পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া; আর গালিচার উপরে সাড়ির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমাব মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোক আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর সেই বাঁকা পাড়ের নীচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল—দুটা তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায় শ্বশুরের ছুটি আর মিলে না। ওদিকে সাম্‌নে একটা অকাল চার পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্ব্ব লগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি;—আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া যাক্‌!

বিবাহ-সভায় চারিদিকে হট্টগোল—তাহারি মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য্য আর কি আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম। কাহাকে পাইলাম? এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি আর অ আছে?

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশঙ্কর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার ইহার বেশি আশীর্ব্বাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেম্নি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন, বলিলেন, "বুড়ি, চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বই কি! কোথাও একটু যদি লোক্‌সান হয় তোমাকে তা'র ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাহার যে সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সাবধান করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গুটিকয়েক অপথ্য ছিল তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি; বাপকে সেই সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল—"বাবা তুমি আমার কথা রেখো—রাখ্‌বে?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য, অতএব কথা না দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কি হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী

অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক্ কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়া-মমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘট্‌কালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন—"সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মত এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মত সসঙ্কোচে বলিলেন—"আমার মেয়েটির বই পড়িবার সখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড় ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থ সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এম্‌নিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইঁহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে একগ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহ সভাতেই বুঝিয়াছিলাম

দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয় অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু সে যে আমার সাধনার ধন ছিল—সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয় তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্য্যের মত ধ্রুব—সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কি হইবে গোপনে রাখিয়া—তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিক্‌রিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কি অকলঙ্ক শুভ্র সে, কি নিবিড় পবিত্র!

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড় মেয়ে, কি জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে! কিন্তু অতি অল্পদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো, কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার শাদা মনটির উপরে একটু রং ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল একদিকের কথা—আবার অন্যদিকও আছে—সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকুরি,—ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেম্‌নি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যাগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন কি হৈমর সঙ্গে পাহাড়

হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এম্‌নিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে—তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখটাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি!

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণসম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোন আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন্‌ যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তা'র পরে বাবার একটা ধারণা ছিল আমার শ্বশুর রাজার প্রধান মন্ত্রীগোছের একটা কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার;—সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা! বাবার বড় আশা ছিল শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূরসম্পর্কের কোন এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবৌ যে বয়সেও আমাকেও হার মানাইল।"

আর এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপূ বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন?"

আমার মা খুব জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, সে কি কথা!

বৌমার বয়স্ সবে এগারো বই তো নয়, এই আস্‌চে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না! কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠিতেই প্রমাণ আছে মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না?"

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতবৌ তোমার বয়স কত বলতো?"

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইসারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না, বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটিপি করিলেন।

বধূর নির্ব্বুদ্ধিতায় মা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমিতো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়স এগারো।"

হৈম চ'ম্‌কিয়া কহিল, "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না!"

মা কহিলেন, "অবাক্ করিল! বেহাই আমার সাম্‌নে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে কখনো না!"—এই বলিয়া আর একবার চোখ টিপিলেন!

এবার হৈম ইসারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল—"বাবা এমন কথা কখনও বলিতে পারেন না।"

মা গলা চাপিয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস্?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনো মিথ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারিদিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক

একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এসব চলিবে না বলিয়া রাখিতেছি।"

হায়রে তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নামিল কেমন করিয়া?

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, যদি কেহ বয়স জিজ্ঞাসা করে কি বলিব?

বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিও আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।"

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমন ভাবে চুপ্ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কি, তাহার কাছে আমার মাথা হেট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম শরৎ-প্রভাতের আকাশের মত তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কি সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মত সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, আমি ইহাদিগকে চিনি না।

সেদিন একখানা সৌখীন বাধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।"

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিও না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাধা।

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়ি পূজার্চ্চনা হইতেছে। এ পর্যান্ত সে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল—সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কি করিতে হইবে?"

ইহাতে কাহারো মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে

লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, একি কাণ্ড! এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে! এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে হৈম একেবারে চুপ্ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সাম্‌নে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড় বড় দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?"

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, খৃষ্টানও নন, হয় তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চ্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন, শুনাইয়াছেন কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতাসম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল—সে আমার ছোটো বোন নারাণী। বৌদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসারযাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সঙ্কোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সঙ্কোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সে-ও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে

শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইসারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারাণীর কাছে শুনিয়াছি শ্বশুরবাড়ির কথা কি লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই?" এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম—"তোমার বাবার চিঠি আর কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোষ্ট করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল—এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি, এ, ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কি?

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো, তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি, তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি, এ, ডিগ্রি অকাতর চিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সঙ্কীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ

লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সমুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ্‌ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চন গাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্‌ করিয়া একটা ধাক্কা দিল—মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে, একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এম্‌নি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কি দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব?

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টক-শয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু এই গিরিনন্দিনী সতেরো বছর কাল অন্তরে বাহিরে কত বড় একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে! কি নির্ম্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না,—তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেইজন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্ব্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্ব্বাক্ মনের কথা হয়; এবং এক একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম কি করি? শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সঙ্কোচের অন্ত ছিল না, কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বৌয়ের শরীর ভালো নয় তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে হৈমই এইরূপ অভূতপূর্ব্ব স্পর্দ্ধায় আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তখনি তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি বৌমা তোমার অসুখটা কিসের?"

হৈম বলিল, "অসুখ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্যে।

কিন্তু হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতঃই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চম্‌কিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ, এ কি? হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর? অসুখ করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই বলা নাই কহা নাই হঠাৎ আমার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন!

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেম্‌নি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অম্‌নি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ

একটি কথা বলিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিলেন না, কেমন আছিস্? আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ি আমার সঙ্গে যাবি?"

হৈম কাঙালের মত বলিয়া উঠিল—"যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুসি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না, একবার তাহ'লে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির মধ্যের উপর বরাৎ দেওয়ার অর্থ কি আমার জানা ছিল। বুঝিলাম কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বৌমার শরীর ভালো নাই! এত বড় অন্যায় অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা?"

আমার শ্বশুর কহিলেন, "জানেন তো উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার—উঁহার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল

পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।"

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল, তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"বটেরে, ইত্যাদি ইত্যাদি!"

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন—স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্ম্মের কাছে সত্যধর্ম্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কি ক'রতে আছে? জান তোমরা, যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জ্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জ্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই তো সেদিন, লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি! বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জ্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত?

পিতায় কন্যায় আর একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুই জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনেরও জন্য দেখি নাই।

তাহারো পরে কি হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয় তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না ইহাও সম্ভব হইতে পারে! কারণ—থাক্ আর কাজ কি!

[ ১৩২১—জ্যৈষ্ঠ ]

# বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম্ম নয়, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্ব্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়—কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক্ সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সে-ই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয়, সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া এক-ঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে—সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জ্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেল খাইতে খাইতে মনের চারিদিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চ্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে। আমি পথিক নহি, পল্লীর

রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই ; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে—আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি—এই গ্রামে একজন মানুষ আছে, যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে ; অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল—তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকাল-বেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দর্জির দোকান বানাইয়াছে ইহার মত এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুইচার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল—আমার ঠাকুরকে দিলাম।—বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এম্‌নি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসররৌদ্রে ল্যাজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড় অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে

প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সে বার তখনো শীত ছিল। সকালের রৌদ্রটি পূবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতালার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দীবোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না, অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা এইখানে নিয়ে আয়।"

বোষ্টমী পায়ের ধূলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম সেই আমার পূর্ব্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসঙ্কোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কি-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড় বড় চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিষকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, "এ আবার কি কাণ্ড? আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন? তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল!"

বুঝিলাম, গাছ-তলায় এ আমাকে অনেক দিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দ্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েক দিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি—তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। বলিলাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ্ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।"

বোষ্টমী ভারি খুসি হইয়া গৌর গৌর বলিয়া উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ্ করিলেই সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্ব্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই সহর ছাড়িয়া এখানে আসি।"

বোষ্টমী কহিল, "সেটা আমি বুঝিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।"

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধূলা লইতে গিয়া দেখিলাম আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড় বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আখের ক্ষেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সাম্‌নে সূর্য্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘনছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা-মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মত গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপ্‌সা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্ত্তির মত করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূর্ব্বদিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মত একসময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্ম্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মত আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্ করিতে করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সে কি কথা?"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায়

দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কি ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমার বিলাত-যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কি খাইয়াছি, না খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য ভাষায় আলোচনা না করাই সঙ্গত। আমার মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, "যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম, "লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।"

সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল আমার এইরকমই দশা।"

বোষ্টমী যে-সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কি করিয়া?"

উত্তরে শুনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সে-ও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আমার তো সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি; আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কি দরকার ছিল বল তো?"

সহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষাজীবিকায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথি-পড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না—আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল—"না, না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমৃত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর ঘরে মনে হয় আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ায় প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয় না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সবচেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরীবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি, তাই বলিলাম, "এই সকল দুর্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো কর তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উঁচুদরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালবাসি। কিন্তু বোষ্টমীর ইহাতে তাক লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল,—"তুমি বলিতেছ ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

সে বলিল, "উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই কি! কিন্তু আমার তাহাতে কি? আমার তো পূজা ওখানে চলিবে না— আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।"

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কি হইবে? সত্য যে চাই। ভগবান সর্ব্বব্যাপী এটা একটা কথা—কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড় বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক

যে আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কি আশ্চর্য্য প্রণালী!

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন? যখনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!"

আমি বলিলাম, "যে লোকটা কোনো কর্ম্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজা-জোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া!

হাত জোড় করিয়া সে বলিল, "গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেম্নি উঠিয়া বসিয়াছি অম্নি তোমার চরণ পাইলাম। আহা সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কি ঠাণ্ডা! কি কোমল! কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো, ঠিক করিয়া বল!"

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্ব্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও!"

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া কতক্ষণ মাথা নত করিয়া একান্ত স্নেহে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখ না বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইল, মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মত প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল, পাগ্‌লি, কা'কে ভক্তি করিস্ তুই? বিশ্বের লোকে যে তা'কে মন্দ বলে। হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?"

কেবল একমুহূর্ত্তের জন্য মনটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কালীর ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, "বেণী ভাবিয়াছিল আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো?"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয় তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মানুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিঁকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্য্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়!"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যা-তারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল—বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।

আমার স্বামী বড় সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয় কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যবসা করিতেন, কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেন না তাঁহার লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তাঁর চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্ব্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কি সুন্দর রূপ তাঁর!

(বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিল—

অরুণ-কিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।)

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন—তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেই জন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই, পাড়ার সইসাঙাতীদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক এক সময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন বিপদ আর কি হইতে পারে? আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা—আজ পর্য্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মত তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্প-বয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাহার সকল কাজই এম্‌নি নিঃশব্দে। পূজাপার্ব্বণে জমিদারের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও আমি এখানেই থাকি। তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।"

আশ্চর্য্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত।

সে যেন বুঝিত, সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনো ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারৎপক্ষে তাহাকে লইয়া চাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসিগে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দীঘিটা প্রাচীনকালের—কোন্ রাণী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রাণী-সাগর। সাঁতার দিয়া এই দীঘি এপার-ওপার-করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দীঘি যখন প্রায় অর্দ্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, মা! ফিরিয়া দেখি, খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস্‌নে, আমি যাচ্ছি। নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কি দেখিতে হয়! এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দীঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মত থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে মা-বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি সেই সমস্ত অনাদর আজ

আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইত, কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এম্‌নি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলে-বয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধূলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলে-বয়সের বন্ধু বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথী ইহার সাম্‌নে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না!

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন—অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্ব্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মত ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহার-বিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁকি ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তারপর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই

আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র—সেদিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুসি করিতে পারি তাহাতেও এতদিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুসি হইতে থাকিত এবং আমার উপর তাঁহার ভক্তি আরো বড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন, আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুসি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখ্‌তে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এম্‌নি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তা'র পর একদিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলট্‌পালট্‌ হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়া-পথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আম-তলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্‌ একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়সড় হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ডালে ডালে রাজ্যের পাখী ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে ঝাপে

ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া অলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখের উপর কেবলি নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন?"

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্য্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুর-ঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মত ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা হঠাৎ শুনিয়া বুঝিতে পারি এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁর শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রং ধরিয়াছে—তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি আর সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, "আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ কর। আমি বিদায় লইলাম।"

স্বামী কহিলেন, "তুমি এ কি বলিতেছ? তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল?"

আমি বলিলাম, "গুরুঠাকুর।"

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন্ বলিলেন?

আমি বলিলাম, আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন আদেশ কেন করিলেন?"

আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনি বুঝাইয়া দিবেন।"

স্বামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।

স্বামী চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, "চল না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।"

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।"

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব-চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

[ ১৩২১—আষাঢ় ]

---

# স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হ'য়েচে আজ পর্য্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই প'ড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেচো, আমিও শুনেচি ; চিঠি লেখ্‌বার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেচি তীর্থ ক'র্‌তে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছো তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলিকাতার সঙ্গে তোমার তাই ; সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েচে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত ক'র্‌লে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিলো ; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রেচেন।

আমি তোমাদের মেজ-বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জান্‌তে পেরেচি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস ক'রে এই চিঠিখানি লিখ্‌চি, এ তোমাদের মেজ-বৌয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জান্‌তো না সেই শিশু-বয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেলো, আমি বেঁচে উঠ্‌লুম্। পাড়ার সব মেয়েরাই ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচ্‌লো, বেটাছেলে হ'লে কি আর রক্ষা পেতো ?—চুরি বিদ্যাতে যম পাকা ; দামী জিনিষের 'পরেই তা'র লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো ক'রে বুঝিয়ে ব'লবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে ব'সেছি।

যেদিন তোমাদের দূর-সম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে' দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। ষ্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকড়া গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্কী ক'রে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছন যায়। সেদিন তোমাদের কি হয়রানী! তা'র উপরে আমাদের বাঙাল-দেশের রান্না,—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেননি।

তোমাদের বড়ো-বৌয়ের রূপের অভাব মেজো-বৌকে দিয়ে পূরণ ক'রবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিলো। নইলে এতো কষ্ট ক'রে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ ক'রতে হয় না—তা'রা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুরদুর্ ক'রতে লাগ্‌লো, মা দুর্গানাম জপ ক'রতে লাগ্‌লেন। সহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারী কি দিয়ে সন্তুষ্ট ক'রবে? মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর, মেয়ের মধ্যে নেই—যে ব্যক্তি দেখতে এসেচে সে তা'কে যে-দামই দেবে সেই তা'র দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সঙ্কোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে ব'স্‌লো! সেদিনকার আকাশের যতো আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সাম্‌নে শক্ত ক'রে তুলে ধ'রবার জন্যে পেয়াদাগিরি ক'রছিলো —আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিলো না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজ্‌তে লাগ্‌লো—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠ্‌লুম্‌। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার ক'র্‌লেন মোটের উপরে আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেলো। কিন্তু আমার রূপের দরকার

কি ছিলো তাই ভাবি! রূপ জিনিষটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গ'ড়্‌তেন, তাহ'লে ওর আদর থাক্‌তো—কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গ'ড়েচেন, তাই তোমাদের ধর্ম্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুল্‌তে তোমার বেশিদিন লাগেনি—কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ ক'র্‌তে হ'য়েচে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতোই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়ে আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চ'ল্‌তে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চ'ল্‌তে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙ্‌বেই। কিন্তু কি ক'র্‌বো বলো? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতোটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হ'য়ে আমাকে তা'র চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেচেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কা'কে? তোমারা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা ব'লে দুবেলা গাল দিয়ে'চা। কটু কথাই হ'চ্চে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা ক'রলুম্।

আমার একটা জিনিষ তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিলো, সেটা কেউ তোমরা জানোনি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌তুম্। সে ছাই-পাঁশ যাই হোক্ না, সেখানে তোমাদের অন্দর-মহলের পাঁচিলি ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি—সেইখানে আমি, আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজ-বৌকে ছাড়িয়ে র'য়েচে, সে তোমরা পছন্দ করোনি চিন্‌তেও পারোনি;—আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব-চেয়ে যেটা আমার মনে জাগ্‌চে সে তোমাদের গোয়াল-ঘর। অন্দর-মহলের সিঁড়িতে ওঠ্‌বার ঠিকপাশের ঘরেই তোমাদের গরু থাকে, সাম্‌নের উঠানটুকু ছাড়া তাদের আর ন'ড়্‌বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ—উপবাসী গরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা ক'রে দিতো। আমার প্রাণ কাঁদ্‌তো। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম্

সেদিন সেই ছুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত সহরের মধ্যে আমার চির-পরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেক্‌লো। যতদিন নতুন বৌ ছিলুম্ নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম্—যখন বড়ো হ'লুম্ তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য ক'রে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেলো। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিলো। সে যদি বেঁচে থাক্‌তো তাহ'লে সেই আমার জীবনে, যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিতো; তখন মেজো-বৌ থেকে একেবারে মা হ'য়ে ব'স্‌তুম্। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম্ কিন্তু মা-হবার মুক্তিটুকু পেলুম্ না।

মনে আছে ইংরেজ-ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য্য হ'য়েছিলো এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হ'য়ে বকাবকি ক'রেছিলো। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ—সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে, উঠোনের আবর্জ্জনা ন'ড়্‌তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ করে। কিন্তু ডাক্তার একটা ভুল ক'রেছিলো, সে ভেবেছিলো এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর জিনিষটা ছাইয়ের মতো; সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তা'র তাপটাকে বুঝ্‌তে দেয় না। আত্মসম্মান যখন ক'মে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য ব'লে মনে হয় না। সেই জন্যে তা'র বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ ক'র্‌তেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়—তাহ'লে যতদূর সম্ভব তা'কে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে উঠে।

যেমন ক'রেই রাখো দুঃখ যে আছে এ কথা মনে ক'র্‌বার কথাও কোনো-দিন মনে আসেনি। আঁতুড় ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভয়ই হ'লো না। জীবন আমাদের কি-ইবা, যে মরণকে ভয় ক'র্‌তে হবে? আদরের

যমে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত ক'রেচে ম'র্‌তে তাদেরই বাধে? সেদিন যম যদি আমাকে ধ'রে টান দিতো, তাহ'লে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপ্‌ড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেম্‌নি ক'রে উঠে আস্‌তুম্‌। বাঙালীর মেয়ে তো কথায় কথায় ম'র্‌তে যায়। কিন্তু এমন মরার বাহাদুরিটা কি! ম'র্‌তে লজ্জা হয়,—আমাদের পক্ষে ওটা এতোই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হ'য়েই অস্ত গেলো। আবার আমার নিত্যকর্ম্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে প'ড়্‌লুম্‌। জীবন তেম্‌নি ক'রেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্য্যন্ত কেটে যেতো, আজ তোমাকে এই চিঠি লেখ্‌বার দরকারই হ'তো না। কিন্তু বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কনা কোথা থেকে উড়ে এসে প'ড়্‌লো, তা'রপর থেকে ফাটল সুরু হ'লো।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তা'র খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাব্‌লে এ আবার কোথাকার আপদ! আমার পোড়া স্বভাব কি ক'র্‌বো বলো, দেখ্‌লুম্‌ তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠেচো, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া —সে কতো বড়ো অপমান! দায়ে প'ড়ে সে-ও যাকে স্বীকার ক'র্‌তে হ'লো, তাকে কি একপাশে ঠেলে রাখা যায়?

তা'র পরে দেখ্‌লুম্‌ আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেচেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এম্‌নি ভাব ক'র্‌তে লাগ্‌লেন যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই—যেন এঁকে দূর ক'র্‌তে পার্‌লেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন এ সাহস তার হ'লো না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সঙ্কট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো। দেখ্‌লুম্‌ বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ ক'রে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়া পরার এম্‌নি

মোটা রকমের ব্যবস্থা করিলেন এবং বাড়ীর সর্ব্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তা'কে এমন ভাবে নিযুক্ত করিলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হ'লো তিনি সকলের কাছে প্রমাণ ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত যে আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেচে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিলো না। রূপও না টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধ'রে কেমন ক'রে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হ'লো সে তো সমস্তই জানো। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ ব'লেই চিরকাল মনে জেনেচেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত ক'রে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুস্কিল হ'য়েচে। আমি সকল দিকে আপনাকে অতো অসম্ভব খাটো ক'র্‌তে পারিনে। আমি যেটাকে ভালো ব'লে বুঝি, আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ ব'লে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়—তুমিও তা'র অনেক প্রমাণ পেয়েচো।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম্। দিদি ব'ল্লেন, "মেজো বৌ গরীবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে ব'স্‌লেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম্ এম্‌নি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ ক'রে বেড়ালেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই প'ড়্‌লো। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পার্‌তেন না, আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হাল্‌কা হলো। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দুচারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা ক'র্‌তেন। কিন্তু তা'র বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিলো না, একথা লুকিয়ে ব'ল্‌লে অন্যায় হতো না। তুমি তো জানো, সে দেখ্‌তে এতোই মন্দ ছিলো যে, প'ড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙ্‌তো তবে ঘরের মেজ্‌টার জন্যেই লোকে উদ্বিগ্ন হ'তো। কাজেই পিতা মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিলো না, এবং তা'কে বিয়ে ক'র্‌বার মতো মনের জোরই বা ক'জন লোকের ছিলো।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এলো। যেন আমার গায়ে তা'র ছোঁয়াচ

লাগ্‌লে আমি সইতে পার্‌বো না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো সর্ত্ত ছিলো না—তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চ'ল্‌তো। তার বাপের বাড়িতে তা'র খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়নি, যে-কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিষ প'ড়ে থাক্‌তে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশেপাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তা'কে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়ে মানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তা'র উপরে তা'কে ভোলাও শক্ত; সেইজন্যে আঁস্তাকুড়েও তা'র স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা ব'ল্‌বার জো নেই। কিন্তু তা'রা বেশ আছে।

তাই বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আন্‌লুম্, তা'র বুকের মধ্যে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। তা'র ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হ'লো। আমার ঘরে যে তা'র একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর ক'রে তা'কে বুঝিয়ে দিলুম্।

কিন্তু আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হ'লো না। দুচার দিন আমার কাছে থাক্‌তেই তা'র গায়ে লাল-লাল কি উঠ্‌লো—হয় তো সে ঘামাচি, নয় তো আর কিছু হবে। তোমরা ব'ল্‌লে বসন্ত। কেননা, ওযে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে ব'ল্‌লে, আর দুই একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই একদিনের সবুর সইবে কে? বিন্দু তো তা'র ব্যামোর লজ্জাতেই ম'র্‌বার জো হ'লো। আমি ব'ল্‌লুম্, বসন্ত হয় তো হোক্—আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাক্‌বো, আর কাউকে কিছু ক'র্‌তে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্ত্তি ধ'রেচো, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভাণ ক'রে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব ক'র্‌চেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেলো। তোমরা দেখি তা'তে আরো ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লে। ব'ল্‌লে, নিশ্চয়ই বসন্ত ব'সে গিয়েচে। কেননা, ওযে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তা'তে একেবারে অজর অমর ক'রে তোলে। ব্যামো হ'তেই চায় না—মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা ক'রে গেলো, কিছুই হ'লো না।

কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেলো, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তা'র যতো বেশি, আশ্রয়ের বাধাও তা'র তেম্নি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙ্‌লো, তখন ওকে আর এক গেরোয় ধ'রলো। আমাকে এম্নি ভালোবাস্‌তে সুরু ক'র্‌লে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এ রকম মূর্ত্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখিনি। বইয়েতে প'ড়েচি বটে, সে-ও মেয়ে পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিলো সে কথা আমার মনে ক'র্‌বার কোনো কারণ বহুকাল ঘটেনি—এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে প'ড়্‌লো এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তা'র চোখের আশ আর মিটতো না। ব'ল্‌তো, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি-ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে পায়নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধ্‌তুম্, সেদিন তা'র ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়্‌তে চাড়্‌তে তা'র ভারি ভালো লাগ্‌তো। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিলো না—কিন্তু বিন্দু আমাকে অস্থির ক'রে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাতো। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হ'য়ে উঠ্‌লো।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দ্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাব গাছ জ'ন্মেচে। যেদিন দেখ্‌তুম্ সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হ'য়ে উঠেচে, সেইদিন জান্‌তুম্ ধরাতলে বসন্ত এসেচে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙীন হ'য়ে উঠ্‌লো সেদিন আমি বুঝ্‌লুম্ হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহবেগে আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিলো—এক একবার তা'র উপর রাগ হ'তো, সে-কথা স্বীকার করি—কিন্তু তা'র এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখ্‌লুম্—যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতোটা আদর-যত্ন ক'র্‌চি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ব'লে ঠেক্‌লো। এর জন্যে খুঁৎ খুঁৎ খিটখিটের

অন্ত ছিলো না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেলো, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিলো এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হ'লো না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়ীতল্লাসী হ'তে লাগ্‌লো তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ ক'রে ব'স্‌লে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে-চর। তা'র আর কোনো প্রমাণ ছিলো না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ীর দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ ক'র্‌তে আপত্তি ক'র্‌তো,—তাদের কাউকে ওর কাজ ক'র্‌বার ফরমাস ক'র্‌লে ও মেয়েও একেবারে সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তো। এই সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেলো। আমি বিশেষ ক'রে একজন আলাদা দাসী রাখ্‌লুম্‌। সেটা তোমাদের ভালো লাগেনি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় প'র্‌তে দিতুম্‌, তা দেখে তুমি এতো রাগ ক'রেছিলে যে আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ ক'রে দিলে। তা'র পরদিন থেকে আমি পাঁচশিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি প'র্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলুম্‌। আর মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এলো তা'কে বারণ ক'রে দিলুম্‌। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেচি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুসি হওনি। আমাকে খুসি না ক'র্‌লেও চলে আর তোমাদের খুসি না ক'র্‌লেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্য্যন্ত আমার ঘটে এলো না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেচে বিন্দুর বয়সও তেম্‌নি বেড়ে চ'লেচে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হ'য়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে ক'রে আমি আশ্চর্য্য হই, তোমরা জোর ক'রে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দাওনি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় করো। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তা'র খাতির না ক'রে তোমরা বাঁচো না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় ক'র্‌তে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হ'লে। বিন্দুর বর ঠিক হ'লো। বড়ো জা ব'ল্‌লেন, "বাঁচ্‌লাম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা ক'র্‌লেন।"

বর কেমন তা জানিনে ; তোমাদের কাছে শুনলুম্ সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগ্‌লো—ব'ল্‌লে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন ?"

আমি তা'কে অনেক বুঝিয়ে ব'ল্‌লুম্,—"বিন্দু, তুই ভয় করিস্‌নে—শুনেচি তোর বর ভালো।"

বিন্দু ব'ল্‌লে,—"বর যদি ভালো হয়, আমার কি আছে যে আমাকে তা'র পছন্দ হবে ?"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখ্‌তে আস্‌বার নামও ক'র্‌লে না। বড়ো দিদি তা'তে বড়ো নিশ্চিন্ত হ'লেন।

কিন্তু দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থাম্‌তে চায় না। সে তা'র কি কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই ক'রেচি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক্ এ কথা ব'ল্‌বার সাহস আমার হ'লো না। কিসের জোরেই বা ব'ল্‌বো ? আমি যদি মারা যাই তো ওর কি দশা হবে ?

একে তো মেয়ে, তা'তে কালো মেয়ে—কার ঘ'রে চ'ল্‌লো, ওর কি দশা হবে—সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাব্‌তে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু ব'ল্‌লে,—"দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি ?"

আমি তা'কে খুব ধ'ম্‌কে দিলুম্, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হ'তে পার্‌তো তাহ'লে আমি আরাম বোধ ক'র্‌তুম্।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তা'র দিদিকে গিয়ে ব'ল্‌লে,—"দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে প'ড়ে থাক্‌বো, আমাকে যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন ক'রে ফেলে দিয়ো না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌ছিলো, সেদিনও প'ড়্‌লো। কিন্তু শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে ; তিনি ব'ল্‌লেন,—"জানিস্ তো, বিন্দী, পতিই হ'চ্ছে স্ত্রীলোকের গতিমুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পার্‌বে না।"

আসল কথা হ'চ্চে কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নাই—বিন্দুকে বিবাহ ক'র্‌তেই হবে—তা'র পরে যা হয় তা হোক্।

আমি চেয়েছিলুম্ বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু তোমরা ব'লে ব'স্‌লে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝ্‌লুম্ বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ ক'র্‌তে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ্ ক'রে যেতে হ'লো। কিন্তু একটি কথা তোমরা কেউ জানো না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু জানাইনি, কেননা তাহ'লে তিনি ভয়েই ম'রে যেতেন,—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম্। বোধ করি দিদির চোখে সেটা প'ড়ে থাক্‌বে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্ম্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা ক'রো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্‌লে,—"দিদি, আমাকে তোমরা তাহ'লে নিতান্তই ত্যাগ ক'র্‌লে?"

আমি ব'ল্‌লুম্,—"না বিন্দী, তোর যেমন দশাই হোক্ না কেন, আমি তোকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'র্‌বো না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিলো, তা'কে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখ্‌বার ঘরের একপাশে বাস ক'র্‌তে দিয়েছিলুম্। সকালে উঠেই আমি নিজে তা'কে দানা খাইয়ে আস্‌তুম্;—তোমার চাকরদের প্রতি দুই একদিন নির্ভর ক'রে দেখেছি, তা'কে খাওয়ানোর চেয়ে তা'কে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি বিন্দু এককোণে জড়সড় হ'য়ে ব'সে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধ'রে লুটিয়ে প'ড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌লো।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি ব'ল্‌ছিস্ বিন্দী?"

"এতো বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে ব'ল্‌তে পারি দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিলো না—কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্ব্বেই কাশী চ'লে গেছেন। শাশুড়ি জেদ ক'রে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর ব'সে প'ড়্লুম্। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ও মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক্ না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল ব'লে বোঝা যায় না—কিন্তু এক একদিন সে এমন উন্মাদ হ'য়ে ওঠে যে তা'কে ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রাখ্‌তে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিলো কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তা'র মাথা একেবারে খারাপ হ'য়ে উঠ্‌লো। বিন্দু দুপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত খেতে ব'সেছিলো, হঠাৎ তা'র স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তা'র মনে হ'য়েচে, বিন্দু স্বয়ং রাণীরাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি ক'রে রাণীকে তা'র নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েচে। এই তা'র রাগ। বিন্দু তো ভয়ে ম'রে গেলো। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তা'কে যখন স্বামীর ঘরে শুতে ব'ল্‌লে বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেলো। শাশুড়ি তা'র প্রচণ্ড, রাগ্‌লে জ্ঞান থাকে না। সে-ও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুক্‌তে হ'লো। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিলো। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হ'য়ে গেলো। স্বামী যখন ঘুমিয়েচে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চ'লে এসেচে, তা'র বিস্তারিত বিবরণ লেখ্‌বার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো। আমি ব'ল্‌লুম্, "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু তুই যেমন ছিলি তেম্‌নি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমরা ব'ল্‌লে, "বিন্দু মিথ্যা কথা ব'ল্‌চে।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "ও কথনো মিথ্যা বলেনি।"

তোমরা ব'ল্‌লে, "কেমন ক'রে জান্‌লে?"

আমি ব'ল্‌লুম্, আমি নিশ্চয় জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস্-কেস্ ক'র্‌লে মুস্কিলে প'ড়্‌তে হবে।

আমি ব'ল্‌লুন্, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েচে এ কথা কি আদালত শুন্‌বে না?"

তোমরা ব'ল্লে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত কর্ত্তে হবে নাকি? কেন আমাদের দায় কিসের?"

আমি ব'ল্লুম্, "আমি নিজের গয়না বেচে যা ক'র্‌তে পারি ক'র্‌বো।"

তোমরা ব'ল্লে, "উকিলবাড়ি ছুটবে না কি?"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত ক'র্‌তে পারি, তা'র বেশি আর কি ক'র্‌বো?

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েচে। সে ব'ল্‌চে সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কি জোর আছে জানিনে—কিন্তু কশাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েচে তা'কে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কশাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মান্‌তে পার্‌লো না। আমি স্পর্দ্ধা ক'রে ব'ল্লুম, "তা দিক্ থানায় খবর!"

এই ব'লে মনে ক'রলুম্, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তা'কে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ ক'রে ব'সে থাকি। খোঁজ ক'রে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদ প্রতিবাদ যখন চ'ল্‌ছিলো তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তা'র ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েচে। বুঝেচে এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে যে বিষম বিপদে ফেল্‌বে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরো বাড়ালে। তা'র শাশুড়ির তর্ক এই যে, তা'র ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেল্‌ছিলো না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্ল্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে তা'র ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা ব'ল্লেন, "ওর পোড়াকপাল, তা নিয়ে দুঃখ ক'রে কি ক'র্‌বো? তা পাগল হোক্ ছাগল হোক্ স্বামী তো বটে।"

কুষ্ঠ রোগীকে কোলে ক'রে তা'র স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েচে, সতী-সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগ্‌ছিলো; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার ক'রে আস্‌তে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি, সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ ক'র্‌তে পেরেচো, তোমাদের মাথা হেঁট হয়নি।

বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেলো কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিলো না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তা'র উপরে তোমাদের ঘরে প'ড়েচি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন? তোমাদের এই-সব ধর্ম্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পার্‌লুম্ না।

আমি নিশ্চয় জান্‌তুম্, ম'রে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আস্‌বে না। কিন্তু আমি যে তা'কে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম্ যে, তা'কে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'র্‌বো না। আমার ছোটো ভাই শরৎ ক'ল্‌কাতায় কলেজে প'ড়্‌ছিলো; তোমরা জানোই তো যত-রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তা'র এতো উৎসাহ যে উপরি উপরি দু'বার সে এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল ক'রেও কিছুমাত্র দ'মে যায়নি। তা'কে আমি ডেকে ব'ল্‌লুম্, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখ্‌তে সাহস ক'র্‌বে না—লিখ্‌লেও আমি পাবো না।"

এ রকম কাজের চেয়ে যদি তা'কে ব'ল্‌তুম্ বিন্দুকে ডাকাতি ক'রে আন্‌তে কিম্বা তা'র পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তাহ'লে সে বেশি খুসি হ'তো।

শরতের সঙ্গে আলোচনা ক'র্‌চি এমন সময় তুমি ঘরে এসে ব'ল্‌লে, "আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েচো?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম্, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম্, —কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্ত্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেচো?"

আমি ব'ল্‌লুম্,—"বিন্দু যদি আস্‌তো তাহ'লে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখ্‌তুম্। কিন্তু সে আস্‌বে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠ্‌লো। তা আমি জান্‌তুম্ শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ ক'র্‌তে না। তোমাদের ভয় ছিলো ওর প'রে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্‌দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মাম্‌লায় প'ড়্‌বে তখন তোমাদের শুদ্ধ জড়িয়ে ফেল্‌বে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্য্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম্, ঘরে ডাক্‌তুম্ না।

তোমার কাছে শুনলুম্ বিন্দু আবার পালিয়েচে, তাই তোমাদের বাড়িতে তা'র ভাসুর খোঁজ ক'র্‌তে এসেচে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধ্‌লো। হতভাগিনীর যে কি অসহ্য কষ্ট তা বুঝ্‌লুম্ অথচ কিছুই ক'র্‌বার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুট্‌লো। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে ব'ল্‌লে, "বিন্দু তা'র খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিলো, কিন্তু তা'রা তুমুল রাগ ক'রে তখনি আবার তা'কে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারৎ এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘ'টেচে তা'র ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরেনি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ ক'র্‌তে যাবেন ব'লে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেচেন। আমি তোমাদের ব'ল্‌লুম্, "আমিও যাবো।"

আমার হঠাৎ এমন ধর্ম্মে মন হ'য়েচে দেখে তোমরা এতো খুসি হ'য়ে উঠ্‌লে যে কিছুমাত্র আপত্তি ক'র্‌লে না। একথাও মনে ছিলো যে, এখন যদি ক'ল্‌কাতায় থাকি তবে আবার কোন্‌দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে ব'স্‌বো। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হ'লো। আমি শরৎকে ডেকে ব'ল্‌লুম্, "যেমন ক'রে হোক্ বিন্দুকে বুধবারে পুরী-যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।"

শরতের মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো,—সে ব'ল্‌লে, "ভয় নেই দিদি, আমি তা'কে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্য্যন্ত চ'লে যাবো—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হ'য়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এলো। তা'র মুখ দেখেই আমার বুক দ'মে গেলো। আমি ব'ল্‌লুম্,—"কি শরৎ, সুবিধা হ'লো না বুঝি?"

সে ব'ল্‌লে,—"না।"

আমি ব'ল্‌লুম্,—"রাজি ক'র্‌তে পার্‌লিনে?"

সে ব'ল্‌লে,—"আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা ক'রে ম'রেচে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়েছিলুম্, তা'র কাছে খবর পেলুম্ তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলো, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট ক'রেচে।"

যাক্ শান্তি হ'লো!

দেশশুদ্ধ লোক চ'টে উঠ্‌লো। ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসান হ'য়েচে।"

তোমরা ব'ল্‌লে "এ সমস্ত নাটক করা!" তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালী মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালী বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দীটার এম্‌নি পোড়াকপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিলো রূপে গুণে কোনো যশ পায়নি—ম'র্‌বার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে ম'র্‌বে যাতে দেশের পুরুষরা খুসি হ'য়ে হাততালি দেবে তাও তা'র ঘটে এলো না! মরেও লোকেদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদ্‌লেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিলো। যাই হোক্ না কেন, তবু রক্ষা হ'য়েচে, ম'রেচে বই তো না; বেঁচে থাক্‌লে কিনা হ'তে পার্‌তো!"

আমি তীর্থে এসেচি। বিন্দুর আর আস্‌বার দ'র্‌কার হ'লো না, কিন্তু আমার দরকার ছিলো।

দুঃখ ব'ল্‌তে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিলো না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক্, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ ব'ল্‌তে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হ'তো তাহ'লেও হয়তো মোটের উপর আমার এম্‌নি ভাবেই দিন চ'লে যেতো এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা ক'র্‌তুম্। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন ক'র্‌তে চাইনে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফির্‌বো না। আমি বিন্দুকে দেখেচি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েচি। আর আমার দরকার নেই।

তারপরে এ-ও দেখেচি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি।

ওর উপরে তোমাদের যতো জোরই থাক্ না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এতো লম্বা নয়! মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজ্‌লো সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধ্‌লো। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্ জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারদিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? তোমার বিশ্বজগৎ তা'র ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন ক'রেই ডাক দিক্ না—একমুহূর্ত্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দর-মহলটার এইটুকুমাত্র চৌকাঠ পেরতে. পারিনে?—তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে ম'র্‌তেই হবে। কতো তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কতো তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশ-বন্ধনেরই হবে জিত,—আর হার হ'ল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজ্‌তে লাগ্‌লো,—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী ক'রে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়্‌চে! ওরে মেজো-বৌ, ভয় নেই তোর! তোর মেজো-বৌয়ের খোলষ ছিন্ন হ'তে এক নিমেষও লাগে না!

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্যে বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিলো। সেই মেয়েটাই তা'র আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন ক'রে দিয়ে গেলো। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখ্‌বার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেচে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখ্‌চেন। এইবার মরেচে মেজ-বৌ।

তুমি ভাব্‌চো আমি ম'র্‌তে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি ক'র্‌বো না। মীরাবাইও তো আমারি মতো মেয়েমানুষ ছিলো—তা'র শিকলও তো কম ভারি ছিলো না, তা'কে তো বাঁচাবার জন্যে ম'র্‌তে হয়নি। মীরাবাই তা'র গানে ব'লেছিলো, "ছাড়ুক্ বাপ, ছাড়ুক্ মা, ছাড়ুক্ যে যেখানে আছে; মীরা কিন্তু লেগেই রইলো, প্রভু, তা'তে তা'রা যা হবার হোক্!" এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচ্‌বো। আমি বাঁচ্‌লুম্।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন—মৃণাল।

[ ১৩২১—শ্রাবণ ]

# ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন একরাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুক্‌রাও নাই।

আশ্চর্য্য এই যে আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্ব্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীষ্মের দিনে হাত পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এম্‌নি ছুটি পাইয়াছি যে ঐ যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব এটা তত কঠিন না—কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারি জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিল না—এমন কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু আজ যখন আর পর্দ্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতি-গুলো কালো ক্রিমির মত কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উঁকিলে উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড় কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ স্বয়ং ধর্ম্ম ছাড়া তা'র আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য-লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল-জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না—এবং সাতসমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাব-দিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিষ বেচিয়াছিল। তা'রই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি 'হকার'কে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়—আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁৎ। ইহাতে বাল্য-লীলার মস্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্ত্তি হইত। আমাদের মাষ্টার হইতে মুদি পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্ত-বাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধান রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তা'র মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু

উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তা'র মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক—বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয়-বছরের ছোটো। আমি তা'র শাসনকর্ত্তার পদ লইয়াছিলাম।

তা'র শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তা'র চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কি স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তা'র সেই বেণীটি, সে-ও আমার মনে পড়ে আর মনে পড়ে, সেই দুইখানি হাত ;—কেন জানিনা তা'র মধ্যে বড়-একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারো হাত ধরিতে চায়—তা'র সেই কচি অঙ্গুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তা'কে দেখিতে পাইয়াছিলাম একথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়—হঠাৎ একদিন কোনো একদিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তা'র বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার-ঘরের জ্ঞান-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয় ; তা'র পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কি যে সৃষ্টি করিত তা'র ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলি তা'কে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলি বলিতে হইত, "অনু, এ সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!" শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু যখন তা'র ছোটো বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কি বাজে কথা বলিত—তা'কে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখী নাই সেখানেও পাখী

আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো-খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তা'কে ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি—বলিয়াছি, "উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনি তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এম্‌নি করিয়া আমি তা'কে যত শাসন করিয়াছি সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুসি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল আমার মত ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারো মনে এটা ছিল কোনো কন্যার পিতার চোখ-এড়াইবার মত ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম বি-এল্ পাস-করা একটি টাট্‌কা মুন্সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরীব—আমি তো জানিতাম সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জ্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কি বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জ্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরো ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তা'কে আরো ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড় অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক্—এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই।

পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে, একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে, বড় ঠকান ঠকিয়াছি। খুব কষিয়া কাজের-লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের-লোক হইবার সব-চেয়ে বড় সরঞ্জাম নিজের পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমৃতি ছিল না। এ জিনিষটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে, অধিকাংশ লোকেই তা'কে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামৎ, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিষের কত দর, বাজার দর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্‌স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান্, এষ্টিমেট্ প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মত ওস্তাদি আমি এক-রকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেকদিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনি আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—তা ছাড়া সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু আধটু ঢিল্ না দিলে ব্যবসা চলে না এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তা'র সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্ল্যান, এষ্টিমেট্ এবং প্রস্পেক্টস্ লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল, তা'র পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেম্‌নি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে

ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তা'র চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোক্‌সান হইত না।" প্রসন্নর মুখটাকে বড় ভয় করিতাম।

অনেকদিন তা'র দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্ম্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি, তা'র শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, "ভাই আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতিশীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্য্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।

প্রসন্নর মুখে এত বড় কথাটা যে কতই বড় তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক-ক্লাসে না পড়িয়াছে তা'রা বুঝিতেই পারিবে না। তা'র উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া রাখিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখেছি দাদা—কিন্তু তা'রাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তা'রা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাৎ করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন। কিন্তু তোমাতে যে মণি-কাঞ্চনযোগ। ধর্ম্মকেও শক্ত করিয়াছ আবার কর্ম্মের বুদ্ধিতেও তুমি পাকা।"

তখন ব্যবসা-ক্ষ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল বাণিজ্য ছাড়া দেশের উন্নতি নাই এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে কেবলমাত্র মূল-ধনটার যোগাড় হইলেই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপদাদা সকলেই একদিনেই সকল প্রকার ব্যবসা পুরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম "আমার, সম্বল নাই যে?"

সে বলিল, "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কি?"

তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বুঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে এতটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয় দাদা! সত্যতাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না—কেবল এই বলিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে মেয়েমানুষের সর্ব্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সী খুলিলাম। কাপড়, কাগজ, কালী, বোতাম, সাবান যতই আনাই বিক্রী হইয়া যায়—একেবারে পঙ্গপালের মতো খরিদ্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে—বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে কিছুই জানি না; টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয় টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেই রকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল—ঠিক সে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল—যে, খুচরা-দোকানদারীর কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে সব ব্যবসা সেই তো ব্যবসা। দেশের ভিতরেই টাকা খাটে, সে টাকা ঘানির বলদের মত অগ্রসর হয় না কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এম্নি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গম্ভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তা'র পরে আমি তা'কে ভারতবর্ষে তিসির ব্যবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লম্ফে কত লাভ হওয়া উচিত, কোথাও বা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে লাল এবং কালো কালীতে অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধুলা লইতে যায় আর কি! সে বলিল—"মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ সব কিছু কিছু বুঝি কিন্তু আজ হইতে দাদা তোমার সাক্‌রেদ্ হইলাম।"

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য—মনে আছে তো? কি জানি হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোক্‌সান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও মুনফাকে কোনো মতেই শতকরা বিশ পঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এম্‌নি করিয়া দোকানদারীর সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদ-বশত ঘটিল এম্‌নি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্ত-বংশের সততা তা'র উপরে সুদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেখার ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়—তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল অথচ আমিই যে কারবারের হর্ত্তা-কর্ত্তাবিধাতা এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তা'র মৎলব এবং আমার স্বাক্ষর, তা'র দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মত এক-গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তা'রও আছে। আমি

জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্য্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মত রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরো একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেম্নি ধনী বলিয়া তা'র স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত দেড় লক্ষ টাকা তা'র জমা আছে, কেহ বলিত আরো অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তা'র স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তা'র সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড় হুণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "অখিলবাবুর-মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যে রকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল—"যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোক্সান চলিতেছে। কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠী গণৎকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চল।"

সনাতন দত্তের বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা! দুর্ব্বলতার দিনে মানব-প্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্ব্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ঙ্কর তখন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে

ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্ব্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম ; জন্মক্ষণ ও সন তারিখ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শুনিলাম, আমি সর্ব্বনাশের শেষ-কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অনুকূল—এখন তিনি আমাকে কোনো একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, "খোল দেখি।" খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তা'কে ক্ষয়-রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন ?—এম্‌নি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম অনুর রোগটি তা'কে এই পৃথিবী হইতে তফাৎ করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তা'কে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তা'র দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তা'র প্রাণটি মৃত্যুর বাহির-দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সেই তা'র করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে যেন তা'র দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি আমার আর বেশি দিন নাই। পর্শু ভাই-ফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাই-ফোঁটা দিয়া যাইব।"

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না।

সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তা'র বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মত। সমস্তটা জড়াইয়া তা'র কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব—পৃথিবী যেন তা'কে পুরা পরিমাণে স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তা'র কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ্ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল?"

আমি বলিলাম, "আজ আর সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যু-সরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্ব্বনাশকে আমার তেমন ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাই-ফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্ত্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম মুলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকার জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুকেই না মানিতে তা'র ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড় খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম সে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ্ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের

কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষ্যা ছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল, আমিও পীড়াপীড়া করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি এলেন না?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়া ছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই সব অনেক দিনের অতি ছোট কথা আমার আসন্ন সর্ব্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড় হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাই-ফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "সুবোধের জন্য এই যা-কিছু এতদিন আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখাশুনার কোনো ত্রুটি হইবে না কিন্তু টাকা আর কারো কাছে রাখিয়ো।"

অনু কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?"

আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি ডাক্তার বলিয়াছে সুবোধের যে রকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশি দিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাত-চল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরো কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অল্প বয়সেই

উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।

আমি কহিলাম, "অনু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মত শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তা'র উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে?"

অনু কহিল, "আমি যে জানি আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।"

অনু কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্ম্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, "সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে তবে বৌমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো। আর এই পান্নার কণ্ঠীটি বৌদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তা'র দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তাঁ'র শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুইদিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তা'র মৃত্যু হইল—আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাই-ফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া টিনের বাক্স-হাতে গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমনি নামিলাম, দেখি প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, খবর ভালো তো?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল—কিন্তু—

আমি বলিলাম—"সে জানি না—যা হয় তা হোক্, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।"

প্রসন্ন বলিল, "তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে লাগিবে।"

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আবার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে মানুষের মনের বড় বড় পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উল্টা। টাকার আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড় বড় আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল তবে সবাই তা'র বিস্তারিত কৈফিয়ৎ চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড় ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর,—সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু, কিন্তু তা'রকথা-বার্ত্তা, চলাফেরা, খেলাধূলা সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড় খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল অথচ ও-টাকাটা না লইলে নয় এম্‌নি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এম্‌নি বিগড়াইয়া গেল যে সুবোধের কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তা'র পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ্য হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু সুবোধের কি এক-রকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়, কি দেখে কি ভাবে তা সে-ই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ন মায়ের কাছে মানুষ—সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না—তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের

মুস্কিল এই যে ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এই জন্মই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তা'র জিনিষপত্র সে কেবলি হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ্ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তা'র কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড় খারাপ। আবার মুস্কিল এই যে ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে—তা'র প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তা'র বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার মৌলিক কাজ,—ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেম্‌নি। সুবোধের স্বভাবটা কর্ম্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব করিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবার সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তা'র সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তা'র আর এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল,—সে আপনাকে এবং আপনার চারিদিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সাম্‌নেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কি একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাকে মাঠ, আর বালিশটাকে গরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালী করাটা যে কত মিথ্যা ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তা'র ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে সে থতমত খাইয়া যায়—আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে সুরু করে এবং নিজেকে সাম্‌লাইবার মত বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে,—নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু'চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু' চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে সৃষ্টি করে,—কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলি বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এম্‌নি অভ্যাস হইয়াছিল যে সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এম্‌নি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তা'র কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকে টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তা'রা চারিদিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারো শান্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাহাদের সুদ বন্ধ। পূর্ব্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তা'রা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলি দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদারেরা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম "সুবোধকে ডাকিয়া দাও।"

সে বলিল "সুবোধ শুইয়া আছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শুইয়া আছে? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে।"

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম "প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্ব্বদা আমার ফাইফরমাস খাটিয়া সুবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কা'কে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফিরে না। এদিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাঁষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তা'র ঢিলামি আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ কাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে চড়িতে তার সাতদিন লাগে।

এক একদিন দেখি বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে—সকালে তা'কে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়—চলিবার সময় যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম "জন্মকুড়ে, কুড়েমোর মহামহোপাধ্যায়।" সে লজ্জিত হইয়া চুপ্ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি, প্রশান্ত মহাসাগরের পর কোন মহাসাগর?" যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম "তুমি, আলস্য মহাসাগর।" পারৎপক্ষে সুবোধ কোনো দিন আমার কাছে কাঁদে না কিন্তু সেদিন তা'র চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত কিন্তু বিদ্রূপ তা'র মর্ম্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল—রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িশুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তা'র পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল হয়ত প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে—সুবোধ তাই লইয়া পলাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিষটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পলাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কি হইবে? আমার কাছে থাকিয়া আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কি করিয়া? সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পলাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল পশ্চাতে ছুটিয়া তাহাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদ মস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময় আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়া আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না। সুবোধ বলিল "টাকা পাই নাই।"

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই তবে সে কেন বলিল টাকা পাই নাই। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে,—কোথায় লুকাইয়াছে।

এই সমস্ত ভালোমানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে সয়তান। আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে!"

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কি করিতে পার কর।"

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তা'র মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনোমতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত!—ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল—ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তা'র চারিদিকে রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা-জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম;—আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল সন্ধ্যাতারাটি ভাই-ফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় একমুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন—মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কি করিলাম, এ কি করিলাম,—ভগবান আমাকে এ কি বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কি দরকার ছিল—আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বালকটির কাছে যদি ধর্ম্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহূর্ত্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এম্‌নিতর নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চির-দিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কি মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চ'মকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়বাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হোক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই এই অপরাধের ভয়ে তা'র মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম কি সুন্দর তা'র মুখখানি, কি করুণা ভরা তা'র দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, "আয় বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!"

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না—ভাবিল আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তা'র মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই ত'ার চৈতন্য হইল না। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তা'র অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কি করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল?"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "এ তো একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তা'র চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েকদিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায়

শোয়াইয়া দিনরাত তা'র সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠিটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখ।—বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।"

কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয়-ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তা'র মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

[ ১৩২১—ভাদ্র ]

# শেষের রাত্রি

১

মাসি!

ঘুমোও যতীন, রাত হ'লো যে।

হোক্ না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি ব'ল্‌ছিলুম্ মণিকে তা'র বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্চি ওর বাপ এখন কোথায়—

সীতারামপুর।

হাঁ সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতো দিন ও রোগীর সেবা ক'র্‌বে? ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।

শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন?

ডাক্তারেরা কি ব'লেচে সে কথা কি সে—

তা সে নাই জান্‌লো—চোখে তো দেখ্‌তে পাচ্চে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইসারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত মত।

বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেচে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখ্‌লুম্ যেন।

হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েচেন আস্‌চে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাব্‌চি—

বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুসি হবেন।

ভাব্‌চি, আমি যাবো। আমার ছোটো বোনকে তো দেখিনি, দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

সে কি কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কি ব'লেচে শুনেচো তো?

ডাক্তার তো ব'ল্‌ছিলো, "এখনো তেমন বিশেষ—"

তা যাই বলুক্, ওর এই দশা দেখে যাবে কি ক'রে?

আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন্, বড়ো আদরের মেয়ে—শুনেচি ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—

তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও তোমার বাবা রাগ ক'র্‌বেন সে আমি ব'লে রাখ্‌চি।

তা জানি। তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—

তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানিনে? কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখ্‌তেই হয় আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখ্‌বো।

আচ্ছা বেশ—তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে ব'ল্‌লেই উনি—

দেখো বউ অনেক স'য়েচি—কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও কিছুতেই সইবো না। তোমার বাবা তোমাকে ভালো রকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পার্‌বে না।

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিকক্ষণের জন্ত রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি সই, গোসা কেন?"

দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন—এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।

ওমা সে কি কথা, যাবে কোথায়? স্বামী যে রোগে ভুগ্‌চে।

আমি তো কিছুই করিনে, ক'র্‌তে পারিও নে ; বাড়িতে সবাই চুপ্‌চাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। এমন ক'রে আমি থাক্‌তে পারিনে তা ব'ল্‌চি।

তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যা হোক্‌।

তা আমি ভাই তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভাণ ক'র্‌তে পারিনে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ-গুঁজ্‌ড়ে ঘরের কোণে প'ড়ে থাকা আমার কর্ম্ম নয়।

তা কি ক'র্‌বে শুনি ?

আমি যাবোই, আমাকে কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

ইস্‌, তেজ দেখে আর বাঁচিনে। চ'ল্লুম্‌, আমার কাজ আছে।

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে—এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান্‌ দিয়া বসিল। বলিল—"মাসি, এই জানলাটা আরেকটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মত রোগীর দরজার কাছে চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা–সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চুপ্‌ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে ক'রে এসেচো মণির মন চঞ্চল—আমাদের ঘরে ওর মন বসেনি। কিন্তু দেখো—"

না বাবা, ভুল বুঝেছিলুম্‌—সময় হ'লেই মানুষকে চেনা যায়।

মাসি !

যতীন, ঘুমোও বাবা।

আমাকে একটু ভাব্‌তে দাও—একটু কথা কইতে দাও! বিরক্ত হ'য়োনা মাসি!

আচ্ছা, বলো বাবা।

আমি ব'ল্‌ছিলুম্‌, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝ্‌তেই কতো সময় লাগে! একদিন যখন মনে ক'র্‌তুম্‌ আমরা কেউ মণির মন পেলুম্‌ না তখন চুপ্‌ ক'রে সহ্য ক'রেচি। তোমরা তখন—

না বাবা, অমন কথা ব'লো না—আমিও সহ্য ক'রেচি।

মন তো মাটির ঢেলা নয়—কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জান্‌তুম্‌ মণি নিজের মন এখনো বোঝেনি—কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝ্‌বে সেদিন আর—

ঠিক কথা যতীন।

সেই জন্যই ওর ছেলে-মানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করিনি।

মাসি এ-কথার কোনো উত্তর করিলেন না—কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া—একান্ত ইচ্ছা মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল-বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না—ও একটু চাহিতে শিখুক্‌—মানুষকে একটু কাঁদানো চাই। কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র, চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে একথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না। মাসি যখন

আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—

"আমি জানি, তুমি মনে ক'রেছিলে মণিকে নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারিনি তাই তা'র উপর রাগ ক'রতে। কিন্তু মাসি সুখ জিনিষটা ঐ তারাগুলির মতো, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কতো ভুল করি, কতো ভুল বুঝি, তবু তা'র ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি? কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভ'রে উঠেচে?

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

আমি ভাব্‌চি মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কি নিয়ে থাক্‌বে?

অল্প বয়স কিসের যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো বাছা অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েচি— তা'তে ক্ষতি হ'য়েচে কি? তাও বলি, সুখেরই বা এতো বেশি দরকার কিসের?

মাসি, মণির মনটি যেই জাগ্‌বার সময় হ'লো অম্‌নি আমি—

ভাবো কেন, যতীন? মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য?

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল।

ওরে মন, যখন জাগ্‌লি না রে
তখন মনের মানুষ এলো দ্বারে।
তা'র চ'লে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙ্‌লো রে ঘুম,
ও তোর ভাঙ্‌লো রে ঘুম অন্ধকারে॥

মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেজেচে?

ন'টা বাজবে।

সবে ন'টা? আমি ভাব্‌ছিলুম্ বুঝি দুটো, তিনটে, কি ক'টা হবে? সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়।—তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অতো ব্যস্ত হ'য়েছিলে কেন?

কালও সন্ধ্যার পর এই রকম কথা কইতে কইতে কতো রাত পর্য্যন্ত তোমার আর ঘুম এলো না—তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে ব'লচি।

মণি কি ঘুমিয়েচে?

না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি ক'রে তবে ঘুমোতে যায়।

বলো কি মাসি, মণি কি তবে—

সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি ক'রে দেয়। তা'র কি বিশ্রাম আছে?

আমি ভাব্‌তুম্ মণি বুঝি—

মেয়েমানুষের কি আর এসব শিখ্‌তে হয়? দায়ে প'ড়্‌লেই আপনি ক'রে নেয়।

আজ দুপুরবেলা মৌরলা-মাছের যে ঝোল হ'য়েছিলো তা'তে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিলো। আমি ভাব্‌ছিলুম্ তোমারি হাতের তৈরি।

কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু ক'র্‌তে দেয়? তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখ্‌তে পারো না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখো তবে দেখ্‌তে পাবে মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে ক'রে রেখে দিয়েচে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্ব্বদা আস্‌তে দিতুম্ তাহ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌তো! ও তো তাই চায়।

মণির শরীর বুঝি—

ডাক্তাররা বলে রোগীর ঘরে ওকে সর্ব্বদা আনাগোনা ক'র্‌তে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখ্‌লে দুদিনে যে শরীর ভেঙে প'ড়্‌বে।

মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখো কি ক'রে?

আমাকে ও বড্ডো মানে ব'লেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়—ঐ আমার আরেক কাজ হ'য়েচে।

আকাশের তারাগুলি যেন করুণা-বিগলিত চোখের জলের মত জল্‌জল্ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস্‌ করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তাহ'লে একবার যদি তা'কে—"

এখনি ডেকে দিচ্চি, বাবা।

আমি বেশিক্ষণ তা'কে এ ঘরে রাখ্‌তে চাইনে—কেবল পাঁচ মিনিট—ছুটো একটা কথা যা ব'লবার আছে—

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে আজ পর্য্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড় কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষ্যায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে—সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না? পারে না যে তাহাও তো নহে নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না? কিন্তু পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড় কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়,—কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই;—বাঁশি একাই বাজিতে পারে কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এই জন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, ছুটো চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে এখনি কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুইজন কথা কহা কঠিন, তিনজনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই

ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক রকম বড় হইয়া পড়ে—সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ তাহার জীবনের এমনতর নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে?

৩

এ কি বৌ, কোথাও যাচ্চো না কি?

সীতারামপুরে যাবো।

সে কি কথা? কার সঙ্গে যাবে?

অনাথ নিয়ে যাচ্চে।

লক্ষ্মী-মা-আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ ক'রবো না, কিন্তু আজ নয়।

টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হ'য়ে গেচে।

তা হোক্, ও লোক্সান গায়ে সইবে—তুমি কাল সকালে চ'লে যেয়ো—আজ যেয়োনা।

মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানিনে, আজ গেলে দোষ কি?

যতীন তোমাকে ডেকেচে, তোমার সঙ্গে তা'র একটু কথা আছে।

বেশ তো, এখনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে ব'লে আস্‌ছি।

না, তুমি ব'ল্‌তে পার্‌বে না যে যাচ্চো।

তা বেশ, কিছু ব'ল্‌বো না, কিন্তু আমি দেরি ক'র্‌তে পার্‌বো না। কালই অন্নপ্রাশন—আজ যদি না যাই তো চ'ল্‌বে না।

আমি জোড়হাত ক'র্‌চি বৌ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত ক'রে যতীনের কাছে এসে ব'সো—তাড়াতাড়ি ক'রো না।

তা কি ক'র্‌বো বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে ব'সে থাক্‌বে না। অনাথ চ'লে গেচে—দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসিগে।

না, তবে থাকো—তুমি যাও। এমন ক'রে তা'র কাছে যেতে দেবো না।

ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এতো দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জ্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চ'লে যাবে—কিন্তু যতো দিন বেঁচে থাক্‌বি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখ্‌তে হবে—ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝ্‌বি।

মাসি, তুমি অমন ক'রে শাপ দিয়ো না ব'ল্‌চি!

ওরে বাপরে, আর কেন বেঁচে আছিস্‌রে বাপ? পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লুম্‌ না।

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন বিছানার উপর যতীন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, "এই এক কাণ্ড ক'রে ব'সেচে।"

কি হ'য়েচে? মণি এলো না? এতো দেরি ক'র্‌লে কেন মাসি?

গিয়ে দেখি সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেচে ব'লে কান্না। আমি বলি, হ'য়েচে কি, আরো তো দুধ আছে। কিন্তু অসাবধান হ'য়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেচে বৌয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তা'কে অনেক ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেচি। আজ আর তাকে আন্‌লুম্‌ না। সে একটু ঘুমোক্‌।

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল, তেম্‌নি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেন না, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

মাসি!

কি বাবা?

আমি বেশ জান্‌চি আমার দিন শেষ হ'য়ে এসেচে। কিন্তু আমার মনে কোনো খেদ নাই। তুমি আমার জন্যে শোক ক'রো না।

না বাবা, আমি শোক ক'রবো না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় একথা আমি মনে করিনে।

মাসি, তোমাকে সত্য ব'লচি মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হ'চ্চে।

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্ব্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল—জীবন মরণের সঙ্গমতীর্থে ঐ নক্ষত্র-বেদীর উপরে সে বসিল—নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মত পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল।—যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল—অনেক কাঁদাইয়াছ—সুন্দর হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না!

৪

কষ্ট হ'চ্চে, মাসি, কিন্তু যতো কষ্ট মনে ক'রচো তা'র কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হ'য়ে আসচে। বোঝাই-নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিলো—আজ যেন বাঁধন কাটা প'ড়েচে—সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চ'ললো। এখনো তা'কে দেখতে পাচ্চি কিন্তু তা'কে যেন আর আমার ব'লে মনে হ'চ্চে না—এ দুদিন মণিকে একবারও দেখিনি মাসি।

পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেবো কি যতীন?

আমার মনে হ'চ্চে, মাসি, মণিও যেন চ'লে গেচে। আমার বাঁধন-ছেড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।

বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসচে।

আমার উইলটা কাল লেখা হ'য়ে গেচে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েচি—ঠিক মনে প'ড়চে না।

আমার দেখ্‌বার দরকার নেই যতীন।

মা যখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিলো না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই ব'ল্‌ছিলুম্‌—

সে আবার কি কথা? আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিলো। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।

কিন্তু এই বাড়িটা—

কিসের বাড়ি আমার! কতো দালান তুমি বাড়িয়েচো, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—

সে কি জানিনে, যতীন? তুই এখন ঘুমো।

আমি মণিকে সব লিখে দিলুম্‌ বটে কিন্তু তোমারি সব রইলো মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য ক'র্‌বে না।

সেজন্যে অতো ভাব্‌চো কেন, বাছা।

তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—

ও কি কথা যতীন? তোমার জিনিষ তুমি মণিকে দিয়েচো ব'লে আমি মনে ক'র্‌বো? আমার এম্‌নি পোড়া মন? তোমার জিনিষ ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পার্‌চো ব'লে তোমার যে সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।

কিন্তু তোমাকেও আমি—

দেখো, যতীন, এইবার আমি রাগ ক'র্‌বো। তুই চ'লে যাবি আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি?

মাসি, টাকার চেয়ে আরো বড়ো যদি কিছু তোমাকে—

দিয়েচিস্‌, যতীন, ঢের দিয়েচিস্‌। আমার শূন্য ঘর ভ'রে ছিলি এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভ'রে পেয়েচি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ ক'র্‌বো না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিষপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক,—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও—এ-সব বোঝা আমার সইবে না।

তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু মণির বয়স অল্প তাই—

ও কথা বলিস্‌নে, ও কথা বলিস্‌নে। ধনসম্পদ দিতে চাস্‌ যে কিন্তু ভোগ করা—

কেন ভোগ ক'র্‌বে না মাসি?

না গো না, পার্‌বে না, পার্‌বে না! আমি ব'ল্‌চি ওর মুখে রুচ্‌বে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।

যতীন চুপ্‌ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মনির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, এম্‌নিই বটে,—আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই সমস্ত আয়োজন এত-বড়ই ফাঁকি।

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিষ তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারিনে।"

কম কি দিয়ে যাচ্চো বাছা? এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক'রে তুমি ওকে যে কি দিয়ে গেলে তা'র মূল্য ও কি কোনো দিন বুঝ্‌বে না? যা তুমি দিয়েচো তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন এই আশীর্ব্বাদ ওকে করি।

আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেচে। মণি কি কাল এসেছিলো—আমার ঠিক মনে প'ড়্‌চে না।

এসেছিলো। তখন তুমি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে। শিয়রের কাছে ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ বাতাস ক'রে তা'র পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেলো।

আশ্চর্য্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখেছিলুম্‌ যেন মণি আমার ঘরে আস্‌তে চাচ্চে—দরজা অল্প-একটু ফাঁক হ'য়েচে—ঠেলাঠেলি ক'রচে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুল্‌চে না। কিন্তু মাসি তোমরা একটু বাড়াবাড়ি ক'রচো—ওকে দেখ্‌তে দাও যে আমি ম'র্‌চি—নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পার্‌বে না।

বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হ'য়ে গেচে।

না, মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগ্‌চে না।

জানিস্ যতীন এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে যে তোমার জন্তে তৈরি ক'র্‌ছিলো। কাল শেষ ক'রেচে।

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিষ—সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে—তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

কিন্তু মাসি, আমি তো জান্‌তুম্ মণি শেলাই ক'র্‌তে পারে না—সে শেলাই ক'র্‌তে ভালোই বাসে না।

মন দিলে শিখ্‌তে কতক্ষণ লাগে? তা'কে দেখিয়ে দিতে হ'য়েচে—ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।

তা ভুল থাক্ না। ও তো প্যারিস্ একজিবিসনে পাঠানো হবে না—ভুল-শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চ'ল্‌বে।

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরো বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য্য ধরিয়া রাত্রের পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে—এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

মাসি, ডাক্তার বুঝি নীচের ঘরে?

হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাক্‌বেন।

কিন্তু আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেচো তো ওতে আমার ঘুম হয় না কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেগে থাক্‌তে দাও। জানো মাসি, বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হ'য়েছিলো—কাল সেই দ্বাদশী আস্‌চে—কাল সেই দিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই—আমি তা'কে সেই কথাটি আজ

মনে করিয়ে দিতে চাই ;—কেবল তা'কে তুমি দুমিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ্ ক'রে রইলে কেন? বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের ব'লেচে আমার শরীর দুর্ব্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো—কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় ব'লচি মাসি, আজ রাত্রে তা'র সঙ্গে দুটি কথা ক'য়ে নিতে পার্‌লে আমার মন খুব শান্ত হ'য়ে যাবে—তাহ'লে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তা'কে কিছু ব'ল্‌তে চাচ্চে ব'লেই এই দুরাত্রি আমার ঘুম হয়নি। মাসি তুমি অমন ক'রে কেঁদোনা। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভ'রে উঠেচে আমার জীবনে এমন আর কখনই হয়নি। সেই জন্যই আমি মণিকে ডাক্‌চি। মনে হ'চ্চে আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তা'র হাতে দিয়ে যেতে পার্‌বো। তা'কে অনেক দিন অনেক কথা ব'ল্‌তে চেয়েছিলুম্ ব'ল্‌তে পারিনি কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করা নয়, তা'কে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাবো না।—না মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারিনে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হ'লো?

ওরে যতীন, ভেবেছিলুম্ আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেচে—কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি এখনো বাকি আছে, আজ আর পার্‌চিনে।

মণিকে ডেকে দাও—তা'কে ব'লে দেবো কালকের রাতের জন্যে যেন—

যাচ্চি বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইলো, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকতে লাগিলেন —ওরে আয়—একবার আয়—আয়রে রাক্ষসী, যে তোকে তা'র সব দিয়েচে তা'র শেষ কথাটি রাখ্—সে ম'র্‌তে ব'সেচে তা'কে আর মারিস্‌নে।

যতীন পায়ের শব্দে চ'ম্‌কিয়া উঠিয়া কহিল,—মণি!

না আমি শম্ভু, আমাকে ডাক্‌ছিলেন?

একবার তোর বৌ-ঠাকুরুণকে ডেকে দে।

কা'কে?

বৌ-ঠাকুরুণকে।

তিনি তো এখনো ফেরেননি।

কোথায় গেচেন?

সীতারামপুরে।

আজ গেচেন?

না আজ তিনদিন হ'লো গেচেন।

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল—সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল—সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা ব'লেচি?"

কোন্ স্বপ্ন?

মণি যেন আমার ঘরে আস্‌বার জন্য দরজা ঠেল্‌ছিলো—কোনো মতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হ'লো না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো কিন্তু কিছুতেই ঢুক্‌তে পার্‌লো না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলো। তা'কে অনেক ক'রে ডাক্‌লুম্ কিন্তু এখানে তা'র জায়গা হ'লো না।

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ্ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টি঳কিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো—প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।

মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েচি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়। আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিয়ে চ'ল্লুম্। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হ'য়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ কর্‌বো।

বলিস্ কি যতীন, আবার মেয়ে হ'য়ে জন্মাবো?—না হয়, তোরি কোলে ছেলে হ'য়েই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্ না।

না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেম্‌নি অপরূপ সুন্দরী হ'য়েই তুমি আমার ঘরে আস্‌বে। আমার মনে আছে আমি তোমাকে কেমন ক'রে সাজাবো।

আর ব'কিস্‌নে যতীন, ব'কিস্‌নে—একটু ঘুমো।

তোমার নাম দে'বো লক্ষ্মীরাণী।

ও তো একেলে নাম হ'লো না।

না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেককেলে ;—সেই সাবেক-কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।

তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আস্‌বো এ কামনা আমি তো ক'র্‌তে পারিনে।

মাসি, তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে করো,—আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?

বাছা, আমার যে মেয়ে মানুষের মন, আমিই দুর্ব্বল—সেই জন্যেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েচি। কিন্তু আমার সাধ্য কি আছে ? কিছুই ক'র্‌তে পারিনি।

মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম্‌ না। কিন্তু এ সমস্তই জমা রইলো, আস্‌চে বারে, মানুষ যে কি পারে তা আমি দেখাবো। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কি ফাঁকি তা আমি বুঝেচি।

যাই বলো বাছা, তুমি নিজে কিছু নাওনি, পরকেই সব দিয়েচো !

মাসি, একটা গর্ব্ব আমি ক'র্‌বো, আমি সুখের উপরে জবরদস্তি করিনি—কোনোদিন এ কথা বলিনি যেখানে আমার দাবী আছে সেখানে আমি জোর খাটাবো। যা পাইনি তা কাড়াকাড়ি করিনি। আমি সেই জিনিষ চেয়েছিলুম্‌ যার উপরে কারো স্বত্ব নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় ক'রে অপেক্ষাই ক'র্‌লুম্‌ ; মিথ্যাকে চাইনি ব'লেই এতদিন এমন ক'রে ব'সে থাক্‌তে হ'লো—এইবার সত্য হয় তো দয়া ক'র্‌বেন। ও কে-ও—মাসি, ও কে ?

কই, কেউ তো না যতীন।

মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—

না বাছা, কাউকে তো দেখ্‌লুম্‌ না।

আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—

কিছু না যতীন—ঐ যে ডাক্তার বাবু এসেচেন।

দেখুন আপনি ওর কাছে থাক্‌লে উনি বড়ো বেশি কথা কন্‌। কয়রাত্রি

এম্‌নি ক'রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাক্‌বে।

না মাসি না, তুমি যেতে পাবে না।

আচ্ছা, বাছা, আমি না হয় ঐ কোণটাতে গিয়ে ব'স্‌চি।

না, না, তুমি আমার পাশেই ব'সে থাকো—আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়্‌চিনে—শেষ পর্য্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।

আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীন বাবু। সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হ'লো—

সময় হ'ল? মিথ্যা কথা। সময় পার হ'য়ে গেচে—এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তা'র কোনো দরকার নেই। আমি ম'রতে ভয় করিনে। মাসি, যমের চিকিৎসা চ'ল্‌চে, তা'র উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো ক'রেচো কেন—বিদায় ক'রে দাও, সব বিদায় ক'রে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথ্যাকেই না।

আপনার এই উত্তেজনা ভালো হ'চ্চে না।

তাহ'লে তোমরা যাও—আমাকে উত্তেজিত ক'রোনা। মাসি, ডাক্তার গেচে? আচ্ছা, তাহ'লে তুমি এই বিছানায় উঠে ব'সো—আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।

আচ্ছা শোও বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।

না মাসি, ঘুমোতে ব'লো না—ঘুমোতে ঘুমোতে হয় তো আর ঘুম ভাঙ্‌বে না। এখনো আর একটু আমার জেগে থাক্‌বার দরকার আছে। তুমি শব্দ শুন্‌তে পাচ্চো না? ঐ যে আস্‌চে। এখনি আস্‌বে।

৫

বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো—ঐ যে এসেচে। একবারটি চাও!

কে এসেচে? স্বপ্ন?

স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেচে—তোমার শ্বশুর এসেচেন।

তুমি কে ?

চিন্‌তে পার্‌চো না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।

মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েচে ?

সব খুলেচে, বাপ আমার, সব খুলেচে।

না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।

শাল নয় যতীন। বউ তোর পায়ের উপর প'ড়েচে—ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্ব্বাদ কর্‌।—অমন ক'রে কাঁদিস্‌নে বৌ, কাঁদ্‌বার সময় আস্‌চে—এখন একটুখানি চুপ্‌ কর্‌!

[ ১৩২১—আশ্বিন ]

---

# অপরিচিতা

## ১

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মত যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মত গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো—তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্ত বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকালফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম—কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এম্‌নি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরীব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষ-মাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মা'র হাতেই আমি মানুষ। মা গরীবের

ঘরের মেয়ে, তাই, আমরা যে ধনী একথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে-কোলেই মানুষ—বোধ করি সেইজন্য শেষপর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজো আমাকে দেখিলে মনে হইবে আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়জোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফল্গুর বালির মত তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতামাত্রেই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে—বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মত করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি—যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো-ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেণ্ট, বিবাহসম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বলো একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এম্. এ. পাস করিয়াছি। সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে ; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই, নিজের

বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই,—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল,—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্ম্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বলো, তবে—"আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মত কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত্ত। আমি হরিশকে বলিলাম "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্ব্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেম্নি। এককালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গল-ঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্য্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরীব গৃহস্থের মতই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলি সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক্‌, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আণ্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না। কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, —আমার পিস্‌তুতো ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।" বিনুদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি চমৎকার, সেখানে তিনি বলেন চলনসই। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মত চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুসি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেন না তিনি বড়োই চুপ্‌চাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে সহরের কারো চেয়ে কম নয় সেইটেকেই তিনি নানাপ্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপ্‌চাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জ্জীব,—একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্ তেজ থাকাটা দোষের—অতএব মামা মনে মনে খুসি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণসম্বন্ধে দুইপক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তা'র পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সে-ও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না—জানিতাম না, দেনা-পাওনা কি স্থির হইল। মনে জানিতাম এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ—এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত আশ্চর্য্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্ব্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্ব্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন এ একেবারে ধরা কথা। এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্যপক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব আমাদের সংসারের এই জেদ, ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক্।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারী করিতে হইলে কেরাণী রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপরপক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাণ্ড বাঁশী, সখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্ব্বর কোলাহলের মত্তহস্তীদ্বারা সঙ্গীত-সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীরে যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুসি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথ বাবুর ব্যবহারটাও নেহাৎ ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্ কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকিল বন্ধু যদি নিয়ত হাত

জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্গদ বচনে কন্সার্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে সুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বারবার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কি কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আস্‌তে হ'চ্চে।"

ব্যাপারখানা এই:—সকলের না হউক্ কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়ি-ভাড়া, সওগাদ, লোকবিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যে রকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন দেওয়া-থোওয়াসম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে, এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ সুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন ইহাতে তুমি কি বল?"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ্ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কি বলিবে? আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

আচ্ছা তবে বোস, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি,—এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কি করিবে? ও সভায় গিয়া বসুক্।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহদের আমলের গহনা,—হাল ফেসানের সূক্ষ্ম কাজ নয়,—যেমন মোটা, তেম্নি ভারী।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া বলিল, এ আর দেখিব কি? ইহাতে খাদ নাই—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোট্‌বইয়ে গহনাগুলির ফর্দ্দ টুকিয়া লইলেন,—পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণে দিবার কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে তা'র অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখ।"

স্যাক্‌রা কহিল, ইহা বিলাতী মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন—"অনুপম যাও, তুমি সভায় গিয়া বোস গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, সে কি কথা? লগ্ন—

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন—"সেজন্য কিছু ভাবিবেন না—এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাৎ ভালোমানুষ-ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন সে কি কথা? বিবাহের পূর্ব্বে বর খাইবে কেমন করিয়া?

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল? বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্ত্তিমতী মাতৃআজ্ঞাস্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন,—"তা সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?

শম্ভুনাথ কহিলেন—"ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব একথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ প্রমাণ হইয়া গেছে আমি কেহই নই।

তা'র পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং

অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্ত্তব্যের বরাৎ দিয়া কোথায় যে মহানির্ব্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া?" কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তা'র শাস্তির উপায় কি?

সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ—যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সৎপাত্রের কপালে এতবড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল,—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান-মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্‌সোশ মিটিত।

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবীতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল তাহা হইলে তামাসার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রং একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তা'র চন্দন আঁকা, গায়ে তা'র লাল সাড়ি, মুখে তা'র লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কি যে তা কেমন করিয়া বলিব? আমার কল্পলোকের

কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্ম নত হইয়া পড়িয়াছিল।—হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক-মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতিসন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মত আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তা'র ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল;—বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে সে ছবি তা'র কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তা'র মুখের দুইধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না? হঠাৎ বাহিরে কারো পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তা'র সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহ সম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তা'র বাপ তা'র মুখের পানে চান আর ভাবেন আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন? হঠাৎ

কোনোদিন তা'র ঘরে আসিয়া দেখেন মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, মা তোর কি হইয়াছে বল্ আমাকে।—মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, কই, কিছুই তো হয় নি বাবা!—বাপের এক মেয়ে যে,—বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তা'র পরে? তা'র পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মত রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক্, আলো জ্বলুক্, দেশ বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক্, তা'র পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এস।—কিন্তু যে ধারাটি চোখের জলের মত শুভ্র, সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেম্‌নি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও—আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসিগে।—তা'র পরে? তা'র পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তা'র পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেল-গাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ ষ্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সে-ও এক স্বপ্ন;—কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—

আর সবই অজানা অস্পষ্ট ;—ষ্টেশনের দীপ কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহুদূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ীর মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন—আলোর নীচে সবুজ পর্দ্দা টানা—তোরঙ্গ বাক্স জিনিষপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলো-মেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট্‌পালট্‌ আস্‌বাব, সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল—শীগ্‌গির চ'লে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।

মনে হইল যেন গান শুনিলাম। বাঙালী মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কি মধুর তাহা এম্‌নি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা—শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, এমন তো আর শুনি নাই।

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিষটি বড়ো কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্ব্বচনীয় আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারি চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম—কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্ম্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল,—আমি জানালার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সাম্‌নে কোনো মূর্ত্তি ছিল না—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ তুমি—চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মত ফুটিয়াছ অথচ তা'র ঢেউ লাগিয়া একটি পাপ্‌ড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল—আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া—"গাড়িতে জায়গা

আছে।" আছে কি, জায়গা আছে কি? জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কা'কেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়? জায়গা আছে, আছে—শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট—মনে আশা ছিল ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি প্ল্যাটফর্ম্মে সাহেবদের আর্দ্দালিদল আস্‌বাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্ এক ফৌজের বড়ো জেনেরালসাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম ফার্ষ্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতে ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না—এখানে জায়গা আছে।

আমি তো চ'মকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্য্যমধুর কণ্ঠ, এবং সেই গানেরই ধুয়া—"জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিষপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মত অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চ'লতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা ষ্টেশনেই পড়িয়া রহিল—গ্রাহ্যই করিলাম না।

তা'র পরে—কি লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে তাহাকে কোথায় সুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে—কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্ম্মল, সৌন্দর্য্যের শুচিতা অপূর্ব্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন কি, সে যে কি রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তা'র বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক—রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মত সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষী কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাৎ কিছুমাত্র ছিল না—ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন্ একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তা'রা বিশপঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তা'র সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তা'র মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয় তাহাকেই শোনে, তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরণা ঝরিয়া পড়ে। তা'র সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্য্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল, আমার মনে হইল আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত

অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।—পরের ষ্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মত করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসঙ্কোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না? হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না?

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দো-মনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মত খাইতেছে সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না, অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল এ মেয়ের বয়স হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারো সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তা'র অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনেরাল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই ষ্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়ীতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে দিয়া তা'রা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্ব্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্ম্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চে শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, না আমরা গাড়ি ছাড়িব না।

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, না ছাড়িয়া উপায় নাই।

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ ষ্টেশন-মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, আমি দুঃখিত কিন্তু—

শুনিয়া আমি কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে আগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা একথা মিথ্যা কথা—বলিয়া নামলেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দ্দালিসমেত ইউনিফর্ম্-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তা'র আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দ্দালিকে প্রথমে ইসারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তা'র কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, ষ্টেশন-মাষ্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি কথা হইল জানি না। দেখা গেল গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেণ ছাড়িল। মেয়েটি তা'র দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে সুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত— ষ্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি মা?

মেয়েটি বলিল, আমার নাম কল্যাণী।

শুনিয়া মা এবং আমি দুইজনেই চ'ম্‌কিয়া উঠিলাম।

তোমার বাবা—

তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।

তা'র পরেই সবাই নামিয়া গেল।

## উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া তা'র পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি—শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, আমি বিবাহ করিব না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন?

সে বলিল, মাতৃআজ্ঞা।

কি সর্ব্বনাশ! এ পক্ষেও মাতুল আছে না কি?

তা'র পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে," সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়,—আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তা'র কাজ করিয়া দিই—আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

[ ১৩২১—কার্ত্তিক ]

---

# তপস্বিনী

১

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে গুমট গেছে, বাঁশ গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা ধরার বেদনার মতো দব্‌দব্‌ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বুঝা যায় খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোরে চারটার সময় উঠিয়া স্নান করিয়া ষোড়শী ঠাকুর ঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তারপরে বিদ্যারত্ন মশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকন্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাৎ থাকে—সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প। নামের সঙ্গে মাখনবাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি এ পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি সৌখীন। জীবন-নিকুঞ্জের মধু সঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে কিন্তু মৌচাকের পানায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা

তার একেবারে সয় না। বড় আশা করিয়াছিল বিবাহের পর হইতে প্রৌঢ়কে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরো বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলে পণ্ডিতমহাশয় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মুনি। বলা বাহুল্য সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিত মশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাষ্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড়ো বড়ো দুই ইঞ্জিন আগে পিছু জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষা সাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন সব নামজাদা মাষ্টার রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্য যুগে সিদ্ধি লাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা—কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই তাপসের পরীক্ষা তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্ম্মারা; তারা বরদাকে বড় জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাষ্টার-মশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখনবাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর এক দল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাদের সঙ্গে রফা হইল এই যে বেতন তো তাঁরা পাইবেনই তারপরে বরদা যদি ফার্ষ্ট ডিভিসানে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথা সময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভি-প্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেটহল পর্য্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মত

এম্নি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই সন্ধ্যা বেলাকার খাবারটা তাকে আরো বেশী করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মত ভয় করিত তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল "এখানে থাকুলে আমার পড়াশুনো হবে না।" মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইতে পারবে?" সে বলিল, "বিলাতে।" মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁর যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয় সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণ স্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড় একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি এ পাশ করা চাই।

এ ও তো বড়ো মুস্কিল! বি এ পাশ না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি এ পাশ না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্ম মৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি এ পাশ বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে চাড়তে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কি? তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বিএ পাশে লাগিয়াছেন?

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ। আর একবার পেন্সিলের দাগ দেওয়া কী বইগুলো তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এমন সময় একটা আঘাত পাইল সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ীর খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ী ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, "দুই বছর লোকসান গেল কত আর এই খরচ টানি!" স্কুল হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয় কিন্তু লোকের কাছে সে এই অপমানের কি কৈফিয়ৎ দিবে!

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর একটা পথ খোলা আছে যেটা বিএ পাশের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা, সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয় সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তারপর একদিন দেখা গেল স্কুল ঘরের মেঝের উপর তার কী-বইএর ছেঁড়া টুকরোগুলো পরীক্ষা দুর্গের ভগ্নাবশেষের মত ছড়ানো পড়িয়া আছে—পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক টুক্‌রা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা—তাহাতে লেখা "আমি সন্ন্যাসী—আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দ স্বামী।"

মাখনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর কোন আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুক্‌রা সাফ হইয়া গেছে—আর সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা তেলের দাগে মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটী মোচনের জন্ম একটা পুরাতন এটলাসের মলাট পাতা; একধারে একটা শূন্ম প্যাক্‌বাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা; দেওয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগডেন কোম্পানির সিগারেটবাক্স-বাহিনী বিলাতী নটীদের মূর্ত্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্মে এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই তাহা হইতে বুঝা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র

ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুর বাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্য্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চির-রুগ্না—কর্ত্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন কি মনে করিতেও তার ভয় করিত। পিস্‌শাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর, বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন, তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া এবাড়ীর একটা প্রথা। এই পিসী যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রকাণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে সে বেশীদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন, তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে যে মুক্তাহারে যে বেদনাবোধ আছে সেকথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি বলিতেন, "দাদা কেন যে এত মাষ্টার পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা বুঝিনে, লিখে পড়ে দিতে পারি বরদা কখনই পাশ ক'রতে পারবে না।" পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসীর মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাষ্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন—পিসি বলিলেন "ধন্যি বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।" তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব প্রথমের চেয়েও আরো আরো আরো অনেক বড়ো হইয়া পাস করে—এত বড়ো, যে স্বয়ং লাট সাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন, এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মত আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, "ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই ওদিকে আছে।" লাট

সাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাটাকেও বাড়ির লোক দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, "এই দেখ না, এল ব'লে!" ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, "কথ্খনো না! ঠাকুর লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায় হায় ক'রতে হয়!"

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন—তার কামনা সফল হইল। একমাস গেল বরদার দেখা নাই; তবু কারো মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছু প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায় পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠ মাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চ'ম্‌কিয়া ওঠে, আশঙ্কা পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এম্‌নি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ সুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল, তখন মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সেকথা পিসিও বলিতে সুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল, তখন পাড়া প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু মানুষটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল, ততই তার স্বভাব নির্ম্মল ছিল, এমন কি, সে যে তামাকটা পর্য্যন্ত খাইত না এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্মেই তো তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়াছিল। পিসি প্রত্যহই

অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কি ছিল? টাকার তো অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা সোণার টুক্‌রো ছেলে!" তাঁর স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারশুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বৌমা যাতে সুখে থাকে মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড় ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন কিছু ফরমাস্ করে যেটা দুর্লভ—অনেকটা কষ্ট করিয়া লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুসি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন,—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মত হইতে পারে।

( ২ )

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারিদিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিষটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিংটা, আলিসার উপর যে কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাট্‌টা, আল্‌নাটা, আল্‌মারিটা—তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে, সমস্ত জিনিষপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের যায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার "ঘর হইল বাহির আর বাহির হইল ঘর।"

একদিন যখন বেলা দশটা; অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোস, ধামা, চুপ্‌ড়ি, শিল-নোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকন্নার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে সতন্ত্র হইয়া জানালার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা

করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোগের আয়োজন কর।"

এই সুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আব্দারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, "বাড়িতে ভালো রকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই।" মাখনবাবুর আয় কিছুকাল হইতে কমিতেছিল, কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্ম্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে যে অধিকাংশ খাঁটি নয় মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কি! বিশেষত জটাধারীরা যখন আহার আরামের অপরিহার্য্য ক্রটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড় ধরিয়া বিদায় করিতে কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেন না কি জানি!—বরদার যে ফটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক মুখের উপর গোঁপ দাঁড়ি জটাজূট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে রকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কতো মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে বুঝি কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তারপর দেখা যায় কণ্ঠস্বর ঠিক মেলে নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্য রকম।

এম্নি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবন যৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই

ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়া ইহার জন্তই তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়,—এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে, এই চিন্তাই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অম্‌নি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন, তেম্‌নি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্ত্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। পবিত্র তার সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার? সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খায়, তার মধ্যে ফলমূলই বেশী। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্ম চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া সুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না—পণ্ডিতমশায় বলিলেন,—"একেই বলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা।"

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধুলা ও আশীর্ব্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল,—এমন কি স্বয়ং পিসি ও তার কাছে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রং তো তার গায়ের তসরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর ভোর বেলাটিতে ঐ যে ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার

সমস্ত দেহ মনের উপর কোন্ একজনের কাণে কাণে কথার মত আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল জানালার কাছে বসিয়া, তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে, সেইটে চুপ্ করিয়া শোনে। এক এক দিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্ মিল্ করে সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুক্‌নো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালী খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চীলের একটি তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের-জগৎ পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তার চতুর্মুখের বেদ বেদান্ত উচ্চারণের অনেক পূর্ব্বের সৃষ্টি, যার রক্তের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝা পড়া হইয়া গেছে তারই ছোট বড়ো হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস মহলে আনাগোণার গোপন পথটা জানে—ষোড়শী তো কৃচ্ছ্র সাধনের কাঁটা গড়িয়া আজো সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রঙকে আরো ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিত মশায়কে ধরিয়া পড়িল আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন! পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ সকল পন্থার প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকির মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারিদিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল বাড়ীর ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে একথা অস্বীকার

করিতে তার মুখে বাধে। তাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলতো?

মাখন বলিলেন, সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যতদূর গেছ সেইখানেই তোমার নাগাল ক'জন লোকে পায়?

তা হউক প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এম্‌নি দুর্দ্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙ্গালীই মোটামুটি তাঁরই মতো—অর্থাৎ খায় দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে দেখিল, বাংলা দেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোর বেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত—কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য দেবলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখী হইয়া দেখা দিলেন। পাখীর লেজে তিনটা মাত্র পালক ছিল; একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটকিলে;—এই পালক তিনটি যে সত্ত্ব, রজ, তম, ঋক্, যজুঃ, সাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, আজ, কাল, পর্শু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কি লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তারপর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরী হইতেছে; দুইজন এম্ এস্ সি ক্লাশের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন, একজন সাব্ জজ তার সমস্ত পেন্সেন্ এই নৈমিষারণ্য ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন; এবং তার পিতৃ মাতৃহীন ভাগ্‌নেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য কমিটির গৃহ সভ্য হইতে হইল।

গৃহীসভ্যের কর্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহীসভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ, অনেক সময় থার্মমিটারের পারার মতো সত্য অঙ্কটার উপরে নীচে ওঠা নাবা করে। অংশ কসিবার সময় মাখনেরও ঠিক ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু এই ভুল চুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহার পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়ো কিছু বাকী রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতিমাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ীর ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, ক'রচো কি? মেয়েটি যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্বিগ্ন মুখে বলিলেন, "তাইতো, কি করি।" ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে তাকে অত্যন্ত মৃদুস্বরে আসিয়া বলিলেন, "মা, এতো অনিয়মে কি তোমার শরীর টিক্‌বে?"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল, তার মর্ম্ম এই, এমন সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

(৩)

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে, এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা, তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব?"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুঝিয়া রহিলেন, তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

"সে কথা এখনি তুমি বুঝ্‌বে না। কিন্তু ঐ এটা নিশ্চয় জেনো স্ত্রীলোক হ'য়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েচ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূর থেকেও তোমাকে সহধর্ম্মিনী ক'রে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী এবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা কি জান্‌তে পারি ?"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন, তারপরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এস।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দ্দেশ মতো তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখ্‌তে পাচ্চ ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কি দেখা যাচ্চে, কিন্তু সেটা যে কি তা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।"

"শাদা কিছু দেখ্‌চো কি ?"

"শাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো ?"

"নিশ্চয়ই বরফ ! কখনো পাহাড় তো দেখিনি তাই এতক্ষণ ঝাপ্‌সা ঠেক্‌ছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লঙ্‌চু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাঁকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল সাধনা আরো অনেক বেশী কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল সেই লঙচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে

আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুঝিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়ই সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা এতদিন তোমার কাছে বলিনি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না, কিন্তু আর চল্‌চে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েচে, কোন্‌দিন আমার বিষয় ক্রোক্‌ করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাহাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্ম্মিণী করিতেছেন—বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাত্র মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয় এই যে দেনা এও সেই লঙ্‌চু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে, এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসি মুখে বলিল, "ভয় কি বাবা?"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাক্‌ব।"

মাখন বুঝিলেন ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড় পরা এক যুবা টপ্‌ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিন্‌তে পার্‌চেন না?"

"একি? বরদা নাকি?"

বরদা জাহাজে লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন এক কাপড় কাচা কল কোম্পানীর ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তা ক'রে দিতে পারি।" বলিয়া ছবি আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

[১৩২৪—জ্যৈষ্ঠ]

# পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্য্যন্ত খাইনে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্য্যন্ত শুকিয়ে ম'রে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিলো এই :—

যাবজ্জীবেৎ নাই বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার সখ বেশী অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন ক'রে টাইম-টেবল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেম্নি ক'রে বইএর ক্যাটালগ পড়্তুম্। আমার দাদার এক খুড়াশ্বশুর বাংলা বই বেরবামাত্র নির্ব্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহঙ্কার এই যে সে বইয়ের একখানাও তার আজ পর্য্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলা দেশে এমন সৌভাগ্য আর কারো ঘটে না। কারণ ধন বল, আয়ুঃ বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হ'চ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আল্মারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির কাছেও দুর্ল্লভ ছিল। "দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে" আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম্ ঐ রুদ্ধদ্বার আল্মারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষুর জিভে জল এসেছে। এই বল্লেই যথেষ্ট হ'বে ছেলেবেলা থেকেই এতো অসম্ভব রকম প'ড়েছি যে পাশ ক'র্তে পারিনি। যতোখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক তার সময় আমার ছিলো না।

আমার ফেল-করা ছেলে বলে আমার মস্ত একটা সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায় বিদ্যার তোলা-জলে, আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজ কাল আমার কাছে অনেক বি-এ, এম-এ এসে থাকে; তারা যতোই আধুনিক হোক্ আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হ'য়ে ব'সে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো, আঠারো উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্কু দিয়ে আঁটা, বাংলা দেশের ছাত্রের দল পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ ক'রতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল রাস্কিনে এসে কাৎ হ'য়ে প'ড়েছে। মাষ্টার মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস ক'রে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো ক'রে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্চি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে চ'লছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হ'ল রাশিয়ান শিখতে সুরু ক'রে ছিলুম। আধুনিকতার যে এক্সপ্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চ'লেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্সলি ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাইনি, টেনিসন্‌কে বিচার ক'রতে ডরাইনে, এমন কি, ইবসেন মেটার লিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে 'সস্তা খাতির বাঁধা কারবার' চালাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনদিন একদল মানুষ সন্ধান ক'রে চিনে নেবে এ আমার আশার অতীত ছিলো। আমি দেখ্‌ছি বাংলা দেশে এমন ছেলেও দু'চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হ'য়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি একটি ক'রে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগ্‌লো।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধ'রলো—বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি তা একদিকে এতো কাঁচা অন্যদিকে এতো পুরনো যে মাঝে মাঝে

তার হাঁফ ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখ্‌তে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়্‌তে লাগ্‌লো। আমি থাকতুম্‌ আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হ'চ্চে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হ'য়ে গিয়েছিলো দ্বৈতা-দ্বৈত সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারো সময় অসময়ের জ্ঞান ছিলো না। কেউ বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নূতন প্রকাশিত ইংরেজী বই হাতে ক'রে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটা বেজে যায় তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ বা সন্ত কলেজের নোট নেওয়া খাতাখানি নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠ্‌বার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি সাহিত্য যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যাঁর ভরসায় এই সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কি হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ ব'লেই বরাবর মনে ক'রে আস্‌তুম্‌। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে সকল কুলাল চক্র ঘুর্‌চে, যাতে মানব-সভ্যতা কতক বা তৈরি হ'য়ে, আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে, কতক বা কাঁচা থাক্‌তে থাক্‌তেই ভেঙে ভেঙে প'ড়্‌ছে, তার কাছে ঘরকন্নার নড়া চড়া এবং রান্না ঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে?

ভবানীর ভ্রূকুটি ভঙ্গী ভবই জানেন এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার এক জোড়া মাত্র, তারও দৃষ্টি শক্তি বই প'ড়ে প'ড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন ক'র্‌তে ব'ল্লে আমার স্ত্রীর ভ্রূ-চাপে কি রকম চাপল্য উপস্থিত হতো তা আমার নজরে প'ড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে উনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা কিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটি মাত্র খোলা ড্রেণ ছিল, সে হ'চ্চে বই কেনার দিক; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা মতো এই আমার সখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুকে কেমন ক'রে যে বেঁচে ছিলো। তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশী জান্‌তেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করিবার জন্যে নয়, পরের উপকার ক'র্‌বার জন্যেও নয়; ওটা হ'চ্ছে কথা ক'য়ে ক'য়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম ক'রবার একটা ব্যায়াম প্রণালী। আমি যদি লেখক হ'তুম্, কিম্বা অধ্যাপক হ'তুম্ তাহ'লে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হ'তো। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম ক'র্‌বার জন্যে তাদের উপায় খুঁজ্‌তে হয় না—যারা ঘরে ব'সে খায় তাদের অন্ততঃ ছাতের উপর হন্‌হন্ ক'রে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈতদলটি জমেনি—তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন ক'রেচেন। যদিচ তিনি প'র্‌তেন মিল্-এর সাড়ী এবং তাঁর গয়নার সোণা খাঁটি এবং নিরেট ছিলো না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুন্‌তেন—সৌজাত্য বিদ্যাই (Eugenics) বলো, মেণ্ডেল তত্ত্বই বলো, আর গণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বলো, তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিলো না। আমার দল-বৃদ্ধির পর হ'তে সে আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হ'য়েছেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনিনি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কি তা আমি জানিনে, আমার শ্বশুরও যে জান্‌তেন তা নয়। শব্দটা শুন্‌তে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয় ওর একটা—কোনো মানে আছে। অভিধান যাই বলুক্ নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তার বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে যত্ন ক'র্‌বার মনোরম উপায় স্বরূপে আমার শ্বশুর আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কি রকম সফল হ'য়েছিলো তা এই ব'ল্লেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি অনিলার হাত ধ'রে ব'ল্লেন, "মা আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাব্‌বার জন্য তুমি ছাড়া আর কেউ রইলো না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষের ছেলেদের জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিলেন তা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। ব'ল্লেন, এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার

নেই—নগদ খরচ ক'রে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ো।

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য্য হ'য়েছিলুম্। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে ব'লে বিজ্ঞ। অর্থাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু ক'র্‌তেন না, হিসেব ক'রে চ'ল্‌তেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তোলার ভার যদি কারো উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিলো সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামায়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে কি ক'রে হলো তা তো ব'ল্‌তে পারিনে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি ব'লে না জান্‌তেন তাহ'লে আমার স্ত্রীর হাতে এতো টাকা নগদ দিতে পার্‌তেন না। আসল তিনি ছিলেন ভিক্টোরিয়া যুগে ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারেন নি।

মনে মনে রাগ ক'রে, আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম্ এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কবো না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিলো কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হ'বে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হ'য়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন আমার কাছে পরামর্শ নিতে এলো না তখন মনে কর্‌লুম ও বুঝি সাহস ক'র্‌চে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "সরোজের পড়াশুনোর কি ক'র্‌চো?" অনিলা ব'ল্লে, "মাষ্টার রেখেচি, ইস্কুলেও যাচ্চে।" আমি আভাস দিলুম্, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজে নিতে রাজী আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েচে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম্। অনিলা হাঁও ব'ল্লে না, নাও ব'ল্লে না। এতোদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হলো অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা ক'রে না। আমি কলেজে পাশ করিনি সেজন্য সম্ভবত ও মনে করে পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমাব নেই। এতোদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা কিছু ব'লেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছু বোঝে নি। ও হয়তো মনে ক'রেচে সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশী জানে। কেননা মাষ্টারের হাতের কাণ-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যা গুলো আট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেচে। রাগ ক'রে মনে

মনে ব'লুম্, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ ক'র্‌বার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবন-নাট্য যবনিকার আড়ালেই জ'মতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বৈগসর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা ক'র্‌চি তখন মনে ক'রেছিলুম্ অনিলার জীবন-যজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্ব'লে নি। কিন্তু আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই যে—সৃষ্টিকর্ত্তা আগুনে পুড়িয়ে—হাতুড়ি পিটিয়ে জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন ; অনিলার মর্ম্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোট ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়ত একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চ'ল্‌ছিলো। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধ'রে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন ক'র্‌তে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আঘাত তৈরি ক'রে উঠ্‌চে। সেই চ'ল্‌তি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন চ'ল্‌তে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝ্‌বে ? অন্ততঃ আমি তো কিছুই বুঝি না। কতো উদ্বেগ, কতো অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কতো অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এতো কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো আমি তা জানিই নি। আমি জান্‌তুম্ যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হ'তো সেইদিনকার উদ্যোগ পর্ব্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব্ব। আজ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব চেয়ে অন্তরতম হ'য়ে উঠেছিলো। সরোজকে মানুষ ক'রে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক উপেক্ষা ক'র্‌তে আমি ওদিকটাতে তাকাই নি, তার যে কি রকম চ'ল্‌চে সেকথা কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলিতে পয়লা নম্বর বাড়িতে লোক এলো। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরী। তারপরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেচে, দুটি একটি

বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্য ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এতো বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবার এলেন, মনে কর, তাঁর নাম রাজা সিতাংশু মৌলি এবং ধ'রে নেওয়া যাক্ তিনি নরোত্তম পুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এতো বড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো জান্‌তেই পার্‌তুম্ না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবজ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেম্‌নি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিলো। সেটি হ'চ্চে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্ম্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারিদিকে যে সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চ'ল্‌তে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা ক'র্‌বার উপকরণ আমার ছিলো।

কিন্তু আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশী তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু'হাত দু'পা একমুণ্ড যাদের আছে তারা হলো মানুষ, যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেছে তারা হলো দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙ্‌তে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের পরে মন দেবার কোনো প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাক্‌বারও জো নেই তারাই হ'চ্চে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝ্‌লুম্ সিতাংশু মৌলি এই দলের মানুষ। এক একজন যে এতো বেজায় অতিরিক্ত হ'তে পারে তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তুম্ না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে যেন দশমুণ্ড বিশ হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙ্‌তে লাগ্‌লো।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিলো এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রেও এখানে নিরাপদে বিচরণ ক'র্‌তে পারে। এমন কি, এখানে সেই পথ-চ'ল্‌তি

অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালী কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু সেদিন থামাকা একটা প্রকাণ্ড "হেইয়ো" গর্জ্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড এক-জোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর কি। যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্চেন, পাশে তার কোচমান ব'সে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধ'রেচেন। আমি কোনোমতে সেই সঙ্কীর্ণ গলির পার্শ্ববর্ত্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধ'রে আত্মরক্ষা ক'র্লুম্। দেখ্লুম্ আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনমতেই ক্ষমা ক'র্তে পারেন না। এর কারণটা পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রেচি। পদাতিকের দুইটি মাত্র পা, সে হ'চ্চে স্বাভাবিক মানুষ। আর যে ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা ; সে হলো দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যর দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম্। কারণ এই পরমাশ্চর্য্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখ্বার জিনিস নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল ক'র্বার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশী জবর দখল ক'রে ব'সে আছেন। এজন্য যদিচ ইচ্ছা ক'র্লেই আমার তিন নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভুলে থাকৃতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সঙ্গীতের যে তাল দিয়ে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্ব্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুব্ড়ে যায়। আর ভোর বেলায় সেই আট দশটা ঘোড়াকে আট দশটা সহিস যখন সশব্দে ম'ল্তে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে তার উড়ে বেহারা, ভোজপুরী বেহারা, তাঁর পাড়ে তেওয়ারি দারোয়ানের দল কেউই স্বর-সংযম কিম্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই ব'লছিলুম্, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল ক'র্বার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হ'চ্চে দৈত্যের লক্ষণ।

সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হ'তে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হতো না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা ক'রে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হ'চ্চে পরিমাণ-সুষমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দন-শোভা নষ্ট হ'য়েছিলো তাদের প্রধান লক্ষণ ছিলো অপরিমিত। আজ সেই অপরিমিত দানবটাই টাকার থলিকে বহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ ক'রেচে। তাকে যদি পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চারঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি; আমি ব'সে ব'সে জোয়ার ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই প'ড়ছিলুম্ এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারক-লিপি ঝন্‌ঝন্ শব্দে আমার শাসির উপর এসে প'ড়লো। সেটা একটা টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতি-কাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে প'ড়লো আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশী ক'রে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। এ'কে ডেকে পাইনে, হেঁকে বিচলিত ক'রতে পারিনে—দুর্ব্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লে একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিক ছুটেচে। খবর পেলুম্ প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা ক'রে মজুরি পায়।

দেখ্‌লুম্ কেবল যে আমার শাসি ভাঙ্‌চে, আমার শান্তি ভাঙ্‌চে তা নয়, আমার অনুচর পরিচরদের মন ভাঙ্‌তে লাগ্‌লো। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠ্‌চে, সেটা তেমন আশ্চর্য্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দ্দার কানাইলালের মনটাও দেখ্‌চি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো। আমার উপর তার নিষ্ঠা ছিলো সেটা উপকরণ-মূলক নয়, অন্তঃকরণ-মূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম্ এমন সময় একদিন লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লুম্ সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম ক'রে

টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটচে। বুঝলুম্ এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে চায়। সন্দেহ হলো ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়—শুধু অমৃতে ওর পেট ভ'র্‌বে না।

আমি পয়লানম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ক'র্‌বার চেষ্টা করতুম্। ব'ল্‌তুম্ সাজ-সজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন র'ঙীন মেঘ যায় স'রে, আকাশের ফাঁক বেরিয়ে প'ড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ ক'রে বল্লে, "মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপ নয়, বি-এ, পাশ ক'রেচে।" কানাইলাল স্বয়ং বি-এ, পাশ-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রীটা সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌লুম্ না।

পয়লা নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্ণেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন—তখন তার পরিচয় পাই। সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য্য বলে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি—তখন মানুষ চিন্তা ক'র্‌তে পার্‌তো না ব'লে চীৎকার ক'র্‌তো। আজও যে সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ ক'র্‌তে ভালোবাসে। কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম্ আমার দ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা-নম্বরে চেলো বেজে উঠ্‌লেই যারা গণিতের ন্যায় শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পার্‌তো না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা নম্বরের দিকে হেল্‌চে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বল্লে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাৎ জুটেচে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খুসি হ'লুম্। আমার দলের লোকদের ব'ল্লুম্, "দেখেচো মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে। তাই, যে সব জিনিষ প্রমাণ যোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝ্‌তেই পারে না, কিন্তু যে সব জিনিষের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝ্‌তে ওদের একটুও দেরী হয় না।"

কানাইলাল হেসে ব'ল্লে "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলার মাহাত্ম্য, পতি-দেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি ব'লুম, "না হে, এই দেখো না আমরা এই পয়লা নম্বরের জাঁক জমক দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেচি, কিন্তু অনিলা ওর সাজ-সজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু'তিনবার বাড়ি-বদলের কথা ব'ল্লে। আমার ইচ্ছাও ছিলো, কিন্তু কলিকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিলো না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেলো কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা নম্বরে টেনিস্ খেল্‌ছে। তারপর জনশ্রুতি শোনা গেলো যতী আর হরেন পয়লা নম্বরে সঙ্গীতের মজলিসে একজন বক্স-হার্মোনিয়াম বাজায় এবং একজন বাঁয়া তবলায় সঙ্গত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান ক'রে খুব প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছে। আমি এদের পাঁচ ছ'বছর ধ'রে জানি কিন্তু এদের যে এসব গুণ ছিলো তা আমি সন্দেহও করিনি। বিশেষত আমি জানতুম্ অরুণের প্রধান সখের বিষয় হ'চ্চে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব, সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কি ক'রে বুঝ্‌বো?

সত্য কথা বলি আমি পয়লা নম্বরকে মুখে যতোই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষ্যা ক'রেছিলুম্। আমি চিন্তা ক'র্‌তে পারি, বিচার ক'র্‌তে পারি, সকল জিনিষের সার গ্রহণ ক'র্‌তে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান ক'র্‌তে পারি—মানসিক সম্পদে সিতাংশু মৌলিকে আমার সমকক্ষ ব'লে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে ঈর্ষ্যা ক'র্‌চি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাস্‌বে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে বেরোতো—কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত ক'র্‌তো। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখ্‌তুম্ আর ভাব্‌তুম্, আহা আমি যদি এই রকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পার্‌তুম্! পটুত্ব ব'লে যে জিনিষটা আমার একেবারেই নেই সেইটের পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিলো। আমি গানের সুর ভালো বুঝি নে কিন্তু জানালা থেকে কতোদিন গোপনে দেখেছি সিতাংশু এসরাজ বাজাচ্চে। ঐ যন্ত্রটার পরে তার একটা বাধাহীন সৌন্দর্য্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য্য মনোহর বোধ হ'তো। আমার মনে হ'তো যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী নারীর মতো ওকে ভালোবাসে —সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা ক'রে বিকিয়ে দিয়েচে। জিনিষ পত্র বাড়ি ঘর জন্তু মানুষ সকলের পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটা শ্রী

বিস্তার ক'রতো। এই জিনিষটি অনির্ব্বচনীয়, আমি একে অত্যন্ত দুর্লভ না মনে ক'রে থাকতে পারতুম না। আমি মনে ক'রতুম পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে প'ড়বে, এ ইচ্ছা ক'রে যেখানে গিয়ে ব'সবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা নম্বরে টেনিস্ খেলতে, কন্সার্ট বাজাতে লাগলো তখন স্থান ত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে মনের মতো অন্য বাসা বরানগর কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হ'তে ব'লতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ার ঘরেও পেলুম না, রান্না ঘরেও না। দেখি শোবার ঘরে জানালার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ্ ক'রে ব'সে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে প'ড়লেন। আমি ব'ল্লুম, "পর্শুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি ব'ল্লেন, "আর দিন পনেরো সবুর করো।"

জিজ্ঞাসা ক'রলুম, "কেন?"

অনিলা ব'ল্লেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে তার জন্য মনটা বড়ো উদ্বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়া চড়া ক'রতে ভালো লাগ্‌চে না।

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কখনো আলোচনা করিনে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়ি বদল মুলতবি রহিল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে বেরোবে সুতরাং দুই নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট-নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হ'য়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ ক'রলেন। তিনি জানেন আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈত দলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেলো না। ডাক দিলুম "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্ "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে তো?" সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে আছে।

আমি ব'ল্লুম্ "তোমার হাতের তৈরী মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্‌নি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না।" এই ব'লে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল ব'সে আছে।

আমি ব'ল্লুম্, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্লে, "সে কি কথা? আজ আমাদের সভা হবে নাকি?"

আমি ব'ল্লুম্, "হবে বৈ কি। সমস্ত তৈরী আছে—ম্যাক্সিম গার্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন কি আমড়ার চাট্‌নি পর্য্যন্ত।"

কানাই অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। খানিক বাদে ব'ল্লে, "অদ্বৈত বাবু, আমি বলি আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশ্ন ক'রে জান্‌তে পার্‌লুম্ আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা ক'রে ম'রেচে। পরীক্ষায় সে পাশ হ'তে পারেনি তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিলো—সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে ম'রেচে।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "তুমি কোথা থেকে শুন্‌লে?"

সে ব'ল্লে, "পয়লা নম্বর থেকে।"

পয়লা নম্বর থেকে!—বিবরণটা এই:—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এলো তখন সে গাড়ী ডাকার অপেক্ষা না ক'রে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া ক'রে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলো। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশু মৌলি এ খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিশকে ঠাণ্ডা ক'রে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলাম। মনে ক'রেছিলুম্ অনিলা বোধ হয় দরজা বন্ধ ক'রে আবার তার শোবার ঘরে আশ্রয় নিয়েচে। কিন্তু এবার গিয়ে দেখি ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাট্‌নির আয়োজন ক'র্‌চে। যখন লক্ষ্য ক'রে তার মুখ দেখ্‌লুম্ তখন বুঝ্‌লুম্ এক রাত্রে তার জীবনটা উলট পালট হ'য়ে গেচে।

আমি অভিযোগ ক'রে ব'ল্লুম্, "আমাকে কিছু বলোনি কেন ?"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে, কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোটো হ'য়ে গেলুম্। যদি অনিলা ব'ল্তো, "তোমাকে ব'লে লাভ কি ?" তা হ'লে আমার জবাব দেবার কিছু থাক্তো না। জীবনের এই সব বিপ্লব, সংসারের সুখ দুঃখ নিয়ে কি ক'রে যে ব্যবহার ক'র্তে হয় আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি ব'ল্লুম্, "অনিলা, এ সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে ব'ল্লে, "কেন হবে না, খুব হবে। আমি এতো ক'রে সব আয়োজন ক'রেচি সে আমি নষ্ট হ'তে দিতে পার্‌বো না।"

আমি ব'ল্লুম্, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে ব'ল্লে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম্। ভাব্‌লুম্ অনিলের শোকটা ততো বেশী কিছু নয়। মনে ক'র্‌লুম্, সেই যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম্ তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হ'য়ে এসেচে। যদিচ সব কথা বোঝ্‌বার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিলো না, কিন্তু তবু পার্সোনাল ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যার সময় আমার দ্বৈত দলের দুই চার জন কম প'ড়ে গেলো। কানাই তো এলোই না। পয়লা নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিলো তারাও কেউ আসে নি। শুন্‌লুম্, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলি চ'লে যাচ্চে তাই তারা সেখানে বিদায় ভোজ খেতে গিয়েচে। এ দিকে অনিলা আজ যে রকম ভোজের আয়োজন ক'রেছিলো এমন আর কোনো দিন ক'রে নি। এমন কি, আমার মতো বেহিসাবী লোকেও এ কথা মনে না ক'রে থাক্‌তে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হ'য়েচে।

সে দিন খাওয়া দাওয়া করে সভাভঙ্গ হ'তে রাত্রি একটা দেড়টা হ'য়ে গেলো। আমি ক্লান্ত হ'য়ে তখনি শুতে গেলুম্। অনিলাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্ "শোবে না ?" সে ব'ল্লে, "বাসন গুলো তুল্‌তে হবে।"

পরের দিন যখন উঠ্‌লুম্ তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে

টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চষমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি আমার চষমা চাপা দেওয়া একটুকুরো কাগজ, তাতে অনিলার হাতের লেখাটি আছে "আম চ'ল্লুম্। আমাকে খুঁজ্‌তে চেষ্টা ক'রো না। ক'র্‌লেও খুঁজে পাবে না।"

কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ না। টিপাইয়ের উপরে একটি টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন কি তার হাতের চুড়ি বালা পর্য্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোচ্ছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের মোড়কে করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলার হাতে যা কিছু জ'মে ছিলো তার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন কোসন জিনিস পত্রের ফর্দ্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লা বাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোঁকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ অনিলা চ'লে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌লুম্—আমার শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ নিলুম্ কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘ'ট্‌লে সে সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা ক'র্‌তে হয় কোনো দিন আমি তার কিছুই ভেবে পাইনে। বুকের ভিতরটা হা হা ক'র্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ পয়লা নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়্‌গড়ায় তামাক টান্‌চে। রাজা বাবু ভোরে চ'লে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক্‌ ক'রে উঠ্‌লো। হঠাৎ বুঝ্‌তে পার্‌লুম্, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা ক'র্‌ছিলুম্ তখন মানব সমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার ক'র্‌ছিলো। ফ্লোবেয়ার, টলষ্টয়, টুর্গেনিভী প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্প-লিখিয়ে-দের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা প'ড়েচি তখন বড়ো আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তার তত্ত্ব কথা বিশ্লেষণ ক'রে দেখেচি। কিন্তু নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত ক'রে ঘ'ট্‌তে পারে তা কোনো দিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে আমি প্রবীন তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হাল্‌কা ক'রে দেখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম্। যে দিন আমার

বিবাহ হ'য়েছিলো সে দিনকার কথা মনে ক'রে শুষ্ক হাসি হাস্‌লুম্‌। মনে ক'র্‌লুম্‌ মানুষ কতো আকাঙ্ক্ষা কতো আয়োজন কতো আবেগের অপব্যয় ক'রে থাকে। কতো দিন কতো রাত্রি কতো বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী ব'লে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে ব'লে চোখ বুজে ছিলুম্‌ এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বুদ্‌বুদ ফেটে গিয়েচে। গেছে থাক্‌গে—কিন্তু জগতের সব বুদ্‌বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে টিঁকে র'য়েচে এমন সব জিনিষকে আমি কি চিন্‌তে শিখি নি?

কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌লুম্‌ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য কালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌লো, আর কোনো আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌লো। বারান্দায় ছাতে পায়চারি ক'র্‌তে ক'র্‌তে শূন্য বাড়িতে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতো দিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাক্‌তে দেখেছি, আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিস পত্র ঘাট্‌তে লাগ্‌লুম্‌। অনিলার চুল বাঁধ্‌বার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুল্‌তেই রেশমের লাল ফিতের বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়্‌লো। চিঠিগুলো পয়লা নম্বর থেকে এসেচে। বুকটা জ্ব'লে উঠ্‌লো। একবার মনে হ'লো সবগুলি পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু যেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ঙ্কর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না প'ড়ে আমার থাক্‌বার জো নেই।

এই চিঠিগুলো পঞ্চাশবার প'ড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন চার টুক্‌রো ক'রে ছেঁড়া। মনে হ'লো পাঠিকা প'ড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তারপরে আবার যত্ন ক'রে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জু'ড়ে রেখেচে। সে চিঠিখানা এই :—

"আমার এ চিঠি না প'ড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা ব'ল্‌বার কথা তা আমাকে ব'ল্‌তেই হ'বে।

আমি তোমাকে দেখেচি। এতো দিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্চি কিন্তু দেখ্‌বার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিস বছর বয়সে প্রথম ঘ'ট্‌লো। চোখের উপরে ঘুমের পর্দ্দা টানা ছিলো; তুমি সোণার কাঠি ছুঁয়ে দিয়েচো—আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখ্‌লুম্‌—যে তুমি স্বয়ং

তোমার সৃষ্টি কর্ত্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্ব্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার আমি তা পেয়েচি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হ'তুম্ তা হ'লে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখ্‌বার দরকার হ'তো না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যেতুম্। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না জানি —কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি ক'র্‌তে পারি এমন সন্দেহ মাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ ক'রো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা ক'র্‌তে পারো তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে, সে কথা লেখ্‌বার দরকার নেই কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাক্‌বে না।"

এমন পঁচিশখানা চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলার কাছ থেকে গিয়েছিলো এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেতো তাহ'লে তখনি বেসুর বেজে উঠ্‌তো;—কিম্বা তাহ'লে সোণার কাঠির জাদু, একেবারে ভেঙে স্তব গান নীরব হ'তো।

কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেচে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখ্‌লুম্। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দ্দা কতো মোটা পর্দ্দা না জানি। পুরোহিতের হাঁত থেকে অনিলাকে আমি চেয়েছিলুম্, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে হাত গ্রহণ ক'র্‌বার মূল্য আমি কিছুই দিইনি। আমি আমার দ্বৈত-দলকে এবং নব্য ন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো ক'রে দেখেচি। সুতরাং যাকে আমি কোনো দিনই দেখিনি, এক নিমেষের জন্যও পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ ক'রে পেয়ে থাকে তবে কি ব'লে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ ক'র্‌বো?

শেষ চিঠিখানা এই:——

"বাইরে থেকে আমি তোমার কিছু জানিনে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেচি তোমার বেদনা। এইখানেই বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে চায় না। ইচ্ছা করে স্বর্গমর্ত্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ ক'রে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার ক'রে

জানি। তারপরে এও মনে হয় তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ ক'র্‌বার অধিকার আমার নেই। কাল ভোর বেলা পর্য্যন্ত মেয়াদ নিয়েচি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তাহ'লে যা হয় একটা কিছু হ'বে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চ'ল্‌বার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখ্‌বো—এক মনে এই মন্ত্র জপ ক'র্‌বো যে, তোমার কল্যাণ হোক্।"

বোঝা যাচ্ছে দ্বিধা দূর হ'য়ে গেছে—দুইজনার পথ এক হ'য়ে মিলেচে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলো আমারই চিঠি হ'য়ে উঠ্‌লো—ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তব মন্ত্র।

কতো কাল চ'লে গেলো, বই প'ড়্‌তে আর ভালো লাগে না। অনিলাকে একবার কোনো মতে দেখ্‌বার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হ'লো কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পার্‌লুম্ না। খবর নিয়ে জান্‌লুম্ সিতাংশু তখন মসুরি পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে অনেকবার সিতাংশুকে পথে বেড়াতে দেখেচি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলাকে দেখিনি। ভয় হ'লো পাছে তাকে অপমান ক'রে ত্যাগ ক'রে থাকে। আমি থাক্‌তে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'র্‌লুম্। সব কথা বিস্তারিত ক'রে লেখ্‌বার দরকার নেই। সিতাংশু ব'ল্লে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি মাত্র চিঠি পেয়েছি—সেটি এই দেখুন।"

এই বলে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল করা সোণার কার্ড কেস্ খুলে তার ভিতর থেকে একটুক্‌রো কাগজ বের ক'রে দিলে। তাতে লেখা আছে, "আমি চ'ল্লুম্, আমাকে খুঁজ্‌তে চেষ্টা ক'রো না। ক'র্‌লেও খোঁজ পাবে না।"

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্দ্ধেকখানা আমার কাছে, এই টুক্‌রোটি তারি বাকি অর্দ্ধেক।

[ ১৩২৪—আষাঢ় ]

———

# পাত্র ও পাত্রী

## ( ১ )

ইতিপূর্ব্বে প্রজাপতি কথনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে ব'সেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তারপরে—কাঁচাঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আস্‌তে চায় না —আমার সেই দশা হ'লো। আমার বন্ধু বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন আমি কৌমার্য্যের লাস্‌ট্‌ বেঞ্চিতে ব'সে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা ক'রে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পাস ক'রেছিলুম্। তখন বিবাহ কিম্বা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় বয়স বিচার ছিলো না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগ্‌তে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক্ আর অখাদ্যই হোক্, শিশুকাল থেকেই তেম্‌নি ছাপার বই দেখ্‌লেই সেটা প'ড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশী এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুলপাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিলো। তবু, আমার সংস্কৃত পণ্ডিত মশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস ক'রেছিলুম্।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐ রকম কোনো একটা জায়গায়। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাক্‌বে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশী তাঁদের ঠ'ক্‌তে হ'বে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিলো কি-একটা ব্রত; দক্ষিণা এবং ভোজন ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এই রকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিলো ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দান দক্ষিণার যে ব্যবস্থা হ'লো তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হ'লুম্। সে পক্ষে যে-আলোচনা হ'য়েছিলো তার মর্ম্মটা এই—আমার তো ক'ল্‌কাতায় কলেজে যাবার সময় হ'লো। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর ক'র্‌বার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ ক'রে যত্ন ক'রে তাঁর দিন কাট্‌তে পারে। পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত—কারণ সে শিশুও বটে সুশীলাও বটে—আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা'ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায় মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হ'লো। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্ত্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিত মশায় ব'ল্লেন, তাঁর "পরিবার" কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হ'তে দেরি হ'লো না; কেননা রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভার হ'লো। মা ব'ল্লেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা" অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দরী না হইলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠ্‌লো। যে পণ্ডিত মহাশয়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় ক'রে এসেচি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ ক'র্‌লে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবন্ত প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হ'য়ে উঠ্‌লো।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে ব'ল্লেন, "সনু, পণ্ডিত মশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেচে, খেয়ে দেখ্।" মা জান্‌তেন আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ ক'র্‌লে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান ক'র্‌লেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে ব'সেছিলো। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হ'য়ে এসেচে, কিন্তু মনে আছে রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া—আর গায়ে ক'ল্‌কাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট; সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতোটা মনে প'ড়্‌চে রং শাম্‌লা, ভুরু জোড়া, খুব ঘন, এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো, বিনা সঙ্কোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে ক'রে রাখা হ'য়েচে। আর যাই হোক্ তাকে দেখ্‌তে নেহাৎ ভালো-মানুষের মতো।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠ্‌লো। মনে মনে বুঝ্‌লুম্, ঐ রাঙ্‌তা-জড়ানো-বেণীওয়ালা জ্যাকেট্-মোড়া সামগ্রীটি ষোল আনা আমার,—আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা ক'র্‌তে হয় কেবল এই একটি জিনিষের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্চেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আস্‌চি, স্ত্রী ব'ল্‌তে কি বোঝায় তা আমার ঐ-সূত্রে জানা ছিলো। দেখেচি, বাবা অন্য সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রী ব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ ক'র্‌তেন। মা তাঁকে ভালোবাস্‌তেন তা জানি কিন্তু কিসে বাবা রাগ ক'র্‌বেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় ক'র্‌তেন এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ ক'র্‌তেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ, কিন্তু মানুষের না কি ওটা অবৈধ পাওনা এই জন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সে দিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে

আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠ্‌লো। সে দিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম্‌—এমন কি, সগর্ব্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখ্‌লুম্‌, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণ কালটা অনুশোচনায় গেলো।

সে দিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্‌ শ্রেণীর—কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জান্‌তে পেরেছিলো। তার পরে যখনি তার সঙ্গে দেখা হ'তো সে শশব্যস্ত হ'য়ে লুকোবার জায়গা পেতো না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভালো লাগ্‌তো। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিলো। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে কোনো-একটা-কিছু করে সেটা বড়ো অপূর্ব্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেতো জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতোকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ একমুহূর্ত্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। বাবা যে রকম মাকে কর্ত্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল ক'রে তুলেচেন, আমিও মনে মনে তারি ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগ্‌লুম্‌। বাবার অভিপ্রেত কোনো একটা লক্ষ্য সাধন ক'র্‌বার সময় মা যে রকম সাবধানে নানা প্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার ক'র্‌তেন আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হ'তে দেখ্‌লুম্‌। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্কনোট থেকে আরম্ভ ক'রে হীরের গয়না পর্য্যন্ত দান ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম্‌। এক-একদিন ভাত খেতে ব'সে তার খাওয়াই হ'লো না এবং জান্‌লার ধারে ব'সে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচ্‌চে এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পেলুম্‌ এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হ'লো তা ব'ল্‌তে পারিনে। ছোটো ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশী সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড় চোপড় রাখা, সমস্ত আমাকে নিজের হাতে ক'র্‌তে হ'তো। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-চিত্রগুলি

স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠ্‌লো তার মধ্যে একটি নাচে লিখে রাখ্‌চি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এই রকম ঘটনাই পূর্ব্বে একদিন ঘ'টেছিলো—এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছু নেই। চিত্রটি এই,—রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ প'ড়্‌চি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে প'ড়ে গেলো। বারান্দায় ব'সে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিলো, আমি তাকে ডাক দিলুম্‌; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে ব'ল্লুম্‌, "দেখো, আমার ব'স্‌বার ঘরের বাঁদিকের আলমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে সেইটে নিয়ে এসো তো।" কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি ব'ল্লুম্‌, "আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।" এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আন্‌লে—সেটা আমি ধপাস্‌ ক'রে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে প'ড়্‌লুম্‌। তখন কাশীর মুখ এতোটুকু হ'য়ে গেলো এবং তার চোখ ছল্‌ ছল্‌ ক'রে উঠ্‌লো। আমি গিয়ে দেখ্‌লুম্‌ তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে ক'রে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম্‌ কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু ব'ল্লুম্‌ না। সে মাথা হেঁট ক'রে বিমর্ষ হ'য়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগ্‌লো এবং নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত ক'রেচে এই অপরাধ কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌লে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত ক'র্‌চেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এদিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা একমুহূর্ত্তে কর্ত্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছলো এবং সেটা নিরতিশয় সদ্ভাববাচ্য।

এমন সময়ে ডাকাতি তদন্ত শেষ হ'য়ে গেলো, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারী রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়্‌বেন ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুব্ধ ব'লে ঘৃণা ক'র্‌তেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা ক'রে কথাটার গোড়াপত্তন ক'র্‌তেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চ'ল্‌চে, একথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন কি বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেচেন। শুভকর্ম্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য ক'র্‌তে সম্মত হ'য়েচে। বাবার আদালতের উকীলের দল চাঁদা ক'রে বিবাহের ব্যয় বহন ক'র্‌তেও রাজি। স্থানীয় এণ্ট্রেন্সস্কুলের সেক্রেটারী বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেচে। সেক্রেটারি বাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েচেন তাকে ধ'রে ধ'রে শুনিয়েচেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হ'য়ে উঠেচে।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুন্‌তে পেলেন। তারপরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজলাসে প্রবলবেগে মাম্‌লা ডিস্‌মিস্‌ এবং প্রচণ্ডতেজে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙ্‌তা-জড়ানো বেণীসহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্দ্ধান; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্ব্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আমাকে সবলে ক'ল্‌কাতায় নির্ব্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপ্‌সে গেলো—আকাশে আকাশে হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হ'লো।

( ২ )

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন—তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘ'টেচে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিনে—আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো একটা রেখে যাবো। বিশ বছর বয়সের পূর্ব্বেই আমি পুরা দমে এম্‌-এ, পরীক্ষা পাস ক'রে চোখে চষমা প'রে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা' দেবার যোগ্য ক'রে বেরিয়ে এসেচি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি

কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো একটা জায়গায়। এতোদিন তো শব্দসাগর মন্থন ক'রে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেলো এবার অর্থসাগর মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ ক'র্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন তাঁর সব চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন্‌ নিয়ে বিলেতে, যিনি আরো কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদ্‌লি হ'য়েছেন, আর যিনি বাংলা দেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিলোনা, তাই তখন চাকুরি থেকে পেন্‌সন্‌ এবং পেন্‌সন্‌ থেকে চাকুরি একই বংশে খেয়া—পারাপারের মতো চ'ল্‌তো। এখন দিন খারাপ তাই বাবা যখন উদ্বিগ্ন হ'য়ে ভাব্‌ছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ ক'র্‌বে কি না এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিসে এলো। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিলো। তিনি সে সময়ে বড়ো দিন উপলক্ষে কমলালেবু ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ ক'র্‌তে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হ'লো। বাবার বাসা ছিলো তাঁর বাড়ির সাম্‌নেই, মাঝে ছিলো এক রাস্তা। বলা বাহুল্য ডেপুটির এম্‌-এ পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব "প্রাংশুলভ্য ফল"। এইজন্যে কন্‌ট্রাক্টর বাবু আমার প্রতি "উদ্বাহু" হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধ্‌লিলম্বিত ছিলো সে পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েচি—অন্তত সে বাহু ডেপুটি বাবুর হৃদয় পর্য্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছলো। কিন্তু আমার হৃদয়টা তখন আরো অনেক উপরে ছিলো।

কারণ আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়, তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিলো না। শুধু তাই নয় তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিলো সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিলো না। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারদিকেই সঙ্কুচিত, মনন-সাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার-ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ক'রে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে

সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে-কুশ ক'রে আনা এ আমি মনেও সহ্য ক'র্‌তে পার্‌তুম্ না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী ক'র্‌তে চাই, সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হ'য়ে থাক্‌বে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝঙ্কার দিয়ে পিছনে টেনে রাখ্‌বে এমন দুর্গ্রহ আমি স্বীকার ক'রে নিতে নারাজ ছিলুম্। আসল কথা আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে' বিদ্রূপ করে, কলেজ থেকে টাট্‌কা বেরিয়ে আমি সেই রকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হ'য়ে উঠেছিলুম্। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিলো। আশ্চর্য্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস ক'র্‌তো যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সাম্‌নে এসে প'ড়্‌লুম্। বাবা ব'ল্লেন "শুভস্য শীঘ্রং।" আমি চুপ্ ক'রে রইলুম্, মনে মনে ভাব্‌লুম্ একটু দেখে শুনে বুঝে প'ড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখ্‌লুম্—কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেলো। মেয়েটি পুতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর—সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হ'য়েচে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে তার ভুরুটি এঁকে তাকে হাতে ক'রে গ'ড়ে তুলেচে। সে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি ক'রে প'ড়্‌তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন ব'লে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড় চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালং বাসন-কোসনকে শোধন এবং মার্জ্জনা করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন ক'র্‌তে বেলা আড়াইটে হ'য়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্ব্বাংশে এম্‌নি পরিশুদ্ধ ক'রে তুলেচেন যে তার নিজের মতো বা নিজের ইচ্ছা ব'লে কোনো উৎপাত ছিলো না। কোনো ব্যবস্থায় যতো অসুবিধাই হোক্ সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সঙ্গত কারণ তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়, সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার ক'র্‌তে শিখেচে। সে

যেমন পাল্কীর ভিতরেই ব'সে গঙ্গাস্নান করে, তেম্নি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের পরে আমারো মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো কিন্তু তাঁর চেয়ে আরো বেশী শ্রদ্ধা যে আর কারো থাক্‌বে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর ক'র্‌বে এটা তিনি সইতে পার্‌তেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে ব'ল্লুম্‌, "মা, এ মেয়ের যোগ্য পাত্র আমি নই"—তিনি হেসে ব'ল্লেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!" আমি ব'ল্লুম, "তাহ'লে আমি বিদায় নিই!" মা ব'ল্লেন, "সে কি সুমু, তোর পছন্দ হ'লো না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখ্‌তে ভালো।" আমি ব'ল্লুম্‌, "মা স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখ্‌বার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই!" মা ব'ল্লেন, "শোন একবার! এরি মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কি পেলি!" আমি ব'ল্লুম্‌, "বুদ্ধি থাক্‌লে মানুষ দিনরাত এই সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচ্‌তেই পারে না। হাঁপিয়ে ম'রে যায়!"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেলো। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েচেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে ব'লে একটা বালাই থাক্‌তে পারে। বস্তুত বাবা যদি অত্যন্ত বেশী রাগারাগি জবরদস্তি না ক'র্‌তেন তাহ'লে হয় তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ ক'রে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান আহ্নিক এবং ব্রত উপবাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ ক'র্‌তে পার্‌তুম্‌। অর্থাৎ মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাক্‌তো তাহ'লে তিনি সময় নিয়ে অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত ক'রে কাজ উদ্ধার ক'রে নিতে পার্‌তেন। বাবা যখন কেবলি তর্জ্জন গর্জ্জন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন আমি তাঁকে মরিয়া হ'য়ে ব'ল্লুম্‌—"ছেলেবেলা থেকে খেতে শুতে চ'ল্‌তে ফির্‌তে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েচেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চ'ল্‌বে না?" কলেজে লজিকে পাশ ক'র্‌বার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনো দিন সফলতা লাভ ক'রেচে এ আমি দেখি নি। সঙ্গত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ ক'রে থাকে। বাবা ভেবে রেখেচেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েচেন, বিবাহের ঔচিত্য

সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতুম্ যে পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেলো তা নয় পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেলো—তাহ'লে দুই উপলক্ষে একটা ফৌজদারী বাধ্‌তো। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা, মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্‌ম্‌টাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্ এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা ক'রেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেচি কিন্তু মনকে তো চুপ্ করিয়ে রাখ্‌তে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেতো সেটা হ'চ্ছে এই যে, এ সব যদি আপনি মানেন তবে পাল্‌বার বেলায় মুর্‌গি পালেন কেন? আরো একটা কথা মনে আস্‌তো; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্ব্বণ বিধিনিষেধ দান দক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘ'ট্‌লে মাকে কঠোর ভাষায় এ সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না ক'রেচেন। মা তখন দীনতা স্বীকার ক'রে, অবলা জাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে, মাথা হেঁট ক'রে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হ'য়েচেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই ক'রে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সঙ্গতি নেই এ কথা ব'লে তাকে রাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়্‌লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে,—যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে ক'রে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা তো থেকেই যায় মাঝের থেকে তার পাকেও জখম ক'রে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক ক'র্‌তে গিয়ে আমার সেই দশা হ'লো। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেলো বটে কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম্। বাবা ব'ল্লেন, "যাও তুমি আত্মনির্ভর করোগে!" আমি প্রণাম ক'রে ব'ল্লুম্, "যে আজ্ঞে!" মা ব'সে ব'সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হ'লো বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে

মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেতো। মেঘ বর্ষণ বন্ধ ক'রে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। তারই জোরে ব্যবসা সুরু ক'রে ছিলুম্। ঠিক উনআশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হ'লো। আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাটচে তা ঈর্ষ্যাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হ'লেও বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফির্‌তে লাগ্‌লো। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিলো এখন তার আর আগল রইলো না। মনে আছে একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় ক'রে ব'ল্লুম্) আমার হৃদয়কে উন্মুখ ক'রেছিলুম্ কিন্তু খবর পেয়েছিলুম্ কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য ক'রে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি—অন্তত ব্যারিষ্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরোপয়েণ্টের নীচে ছিলুম্। কিন্তু পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয় লাঞ্চ্ খেয়েচি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্ খেলেচি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাষ্ মহলের ইংরেজি ভাষায় কথাবার্ত্তা শুনেচি। আমার মুস্কিল এই যে, র‍্যাসেলস্, ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ ষ্টীল্ প'ড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েচি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। O my, O dear, O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো *আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরোতেই* চায় না। আমার যতোটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটেবাজারে কেনা-বেচা ক'র্‌তে পারি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরেজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে ক'র্‌লে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলা ভাষার যে রকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমী সুরে মধুরালাপ ক'র্‌তে গেলে ঠ'ক্‌তে হ'বে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক্, এই সব বিলিতি গিল্টি করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হ'য়েছিলো। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম্ দরজা যখন খুল্‌লো তখন আর তার ঠিকানা পেলুম্ না। তখন আমার কেবল মনে হ'তে লাগ্‌লো সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত ক'র্‌তো,

এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদব কায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ ক'রে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্চে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখ্‌লে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌তো এরাও তেম্‌নি এক্‌সেণ্টের একটু খুঁৎ কিম্বা কাঁটা চাম্‌চের অল্প বিপর্য্যয় দেখ্‌লে ঠিক তেম্‌নি ক'রেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতি-বেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হ'লো এই যে, মেয়ে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মালো, আমি ঠিক ক'র্‌লুম্‌, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান আচমন উপবাসের অকর্ম্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হ'লে ওরা বাঁচে কি ক'রে। বইয়ে প'ড়েচি একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে কিন্তু মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েচেন!

এদিকে বয়স যতো বাড়্‌তে চ'ল্‌লো বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও ততো বেড়ে উঠ্‌লো। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না ক'রেও বিবাহ ক'র্‌তে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ ক'র্‌তে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বে-পরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিঃশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে ক'রে ফেল্‌বে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেচি ভালোবাসা অন্ধ কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসার-বুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরো বেশী চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কি দেখ্‌তে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু সে গুলো তো ধরা প'ড়্‌তে দেরি লাগে, এক চাহ্‌নিতেই বোঝা যায় না। আমার নাশার মধ্যে যে-খর্ব্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ ক'রেচে জানি কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হ'য়ে আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার ক'রে রেখে দিলেন। যাই হোক্‌ যখন দেখি কোনো সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিসেই আমাকে বিয়ে ক'র্‌তে অত্যল্পমাত্র আপত্তি করে না তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো কমে। আমি যদি মেয়ে

হতুম্ তা'হলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব্ব নাসার দীর্ঘনিঃশ্বাসে তার আশা এবং অহঙ্কার ধূলিসাৎ হ'তে থাক্‌তো।

এম্‌নি ক'রে আমার বিবাহের বোঝাইহীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেচে কিন্তু ঘাটে এসে পৌছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। একটা কথা ভুলে ছিলুম্ বয়সও বাড়্‌চে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটনাগপুরের এক সহরে গিয়ে দেখি পণ্ডিতমশায় সেখানে শাল বনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে ব'সে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু প'ড়েছিলো। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় ব'ল্লেন, কালে আমি যে অসামান্য হ'য়ে উঠ্‌বো এ তিনি পূর্ব্বেই জান্‌তেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য রকম গোপন ক'রে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা ব'ল্‌তে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র অবস্থায় ষত্বণত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুর বাড়িতে ছিলো, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হ'য়ে উঠ্‌লুম্। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হ'য়েচে—কিন্তু তিনি নাৎনীতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিলো তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্দ্ধক্যের অপরাহ্নকে নানা রঙে রঙীন ক'রে তুলেছেন। তাঁর অমরুশতক আর্য্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চারদিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌চে। আমি হেসে ব'ল্লুম্, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপার খানা কি!" তিনি ব'ল্লেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে ব'লে যে শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন, এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেলো আমি একা। বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ আমি নিজের ভাবে নিজে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েচি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে, তাঁর বয়স হ'য়েচে, কিন্তু আমার যে হ'য়েচে সে আমি স্পষ্ট জান্‌লুম্। বয়স হ'য়েচে ব'ল্‌তে এইটে বোঝায়, নিজের চারিদিককে

ছাড়িয়ে এসেচি—চারপাশে ঢিলে হ'য়ে ফাঁক হ'য়ে গেচে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে খ্যাতি দিয়ে বোজান যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্চি নে কেবল বস্তু সংগ্রহ ক'রচি এর ব্যর্থকতা অভ্যাস বশত ভুলে থাকা যায় কিন্তু পণ্ডিত-মশায়ের ঘর যখন দেখ্‌লুম্‌ তখন বুঝ্‌লুম্‌, আমার দিন শুষ্ক আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক ক'রে ব'সে আছেন যে আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ; এই কথা মনে ক'রে আমার হাসি এলো। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাক্‌লে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্য থাকি। পণ্ডিত-মশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই এই তফাৎ। আমি আরাম কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম্‌ পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্দ্ধক্যে নাৎনী, নাৎবৌ। এম্‌নি ক'রে মেয়েদের মধ্যদিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্ম্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট ক'রে ধ'র্‌লো। মনের সাম্‌নে আমার ভাবী বৃদ্ধ বয়সের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখ্‌লুম্‌—দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে ম'র্‌তে হ'বে! আর দেরি ক'র্‌লে তো চ'ল্‌বে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে ব'সে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্চে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটু খানি ভেবে দেখা যাক্‌। কিন্তু জীবনের যে অংশে মূলতুবি প'ড়েচে সে-অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চ'ল্‌বে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক সহরে যেতে হ'লো। সেখানে বিশ্বপতি বাবু ধনী বাঙালী মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিলো। লোকটি খুব হুসিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা ক'র্‌তে বিস্তর সময় লাগে। এক দিন বিরক্ত হ'য়ে যখন ভাব্‌চি এ কে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হ'বে না, এমন কি, চাকরকে আমার জিনিষপত্র প্যাক ক'র্‌তে ব'লে দিয়েচি হেনকালে বিশ্বপতি বাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে ব'ল্লেন,

"আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক রকম লোকের আলাপ আছে আপনি একটু মনোযোগ ক'র্‌লে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই—নন্দকৃষ্ণবাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালী-ইংরাজি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হ'য়ে। কাজ ক'রেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়েছিলো এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে এতদূরে সামান্য বেতনে চাকুরি ক'র্‌তে এলেন কি কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস ক'রাতে তাঁর খ্যাতি ছিলো তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন ক'রে বেরিয়ে প'ড়্‌লো তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিলো বটে কিন্তু কুল ছিলো না। সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন কি তার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্ত্বিক গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধ'র্‌লে তিনি ব'ল্লেন, "হাঁ, জাতে ছোটো বটে কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী।" তখন প্রশ্ন উঠ্‌লো, এমন বিবাহ বৈধ হয় কি ক'রে? যিনি প্রশ্ন ক'রেছিলেন নন্দকৃষ্ণ বাবু তাকে ব'ল্লেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী ক'রে' পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ ক'রেচেন এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েচেন। শালগ্রামের কথা ব'ল্‌তে পারিনে কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশী কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা ক'র্‌তে চাইনে।" যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথা গুলি ব'ল্লেন তিনি খুসি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট ক'র্‌বার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিলো। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ ক'রে এই বর্ত্তমান সহরে এসে ওকালতি সুরু ক'র্‌লেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুতে ছিলেন,—উপবাসী থাক্‌লেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যতো অসুবিধা হোক্ শেষকালে উন্নতি হ'তে লাগ্‌লো। কেননা হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'র্‌তেন। একখানি বাড়ি ক'রে একটু জমিয়ে ব'সেচেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এলো। দেশ উজাড় হ'য়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি ক'রছিলো ব'লে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে জানাতেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ ব'ল্লেন, "সাধুলোক পাই কোথায়?" তিনি ব'ল্লেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।" তিনি ভার পেলেন

এবং এই ভার বহন ক'রতে ক'রতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছ তলায় মারা যান। ডাক্তার ব'ল্লে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে মৃত্যু হ'য়েচে।

গল্পের এতোটা পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বেই জানা ছিলো। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি ব'লেছিলুম্, "এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল ক'রে শুকিয়ে ম'রে গেচে,—না রেখেচে নাম, না রেখেচে টাকা,—তারাই ভগবানের সহযোগী হ'য়ে সংসারটাকে উপরের দিকে"—এইটুকু মাত্র ব'লতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হ'য়ে গেলো। কারণ আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ প'ড়্‌ছিলেন —তিনি তাঁর চষমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে ব'লে উঠ্‌লেন, "হিয়ার্ হিয়ার্!"

যাক্ গে। শোনা গেলো নন্দকৃষ্ণের বিধবা স্ত্রী তাঁর একটী মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হ'য়েছিলো ব'লে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন, দীপালী। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না ব'লে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রেচেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হ'বে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয় —কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হ'বে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় ক'রে ব'ল্লেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম্ম হ'বে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুক্‌নো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক ব'লে মনে মনে একটু অবজ্ঞা ক'রেছিলুম্। বিধাতার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গ'লে গেলো। ভাব্‌লুম্, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের ক'রে পুঁতে দেখা গেছে তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েচে—তেম্‌নি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃত-স্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ ম'রতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে ব'ল্লুম্, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হ'বে না। আপনার কথা এবং দিন ঠিক করুন।"

"কিন্তু মেয়ে না-দেখেই তো আর——"

"না-দেখেই হ'বে।"

"কিন্তু পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশী নেই। মা ম'রে গেলে কেবল ঐ বাড়ীখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে সেজন্যে ভাব্‌তে হ'বে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি——"

"সে এখন ব'ল্‌বো না, তাহ'লে জানাজানি হ'য়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হ'বে।"

"ব'ল্‌বেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এতো বেশী নেই যে ভাবনা হ'তে পারে; গুণও এতো বেশী নেই যে, লোভ করা চলে। আমি যতো দূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হ'লেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেলো। যে-কারবারে ইতিপূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বন্‌ছিলো না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিষ্ট্রী দলিল সই ক'র্‌বার জন্যে আমার উৎসাহ হ'লো! তিনি যাবার সময় ব'লে গেলেন, "পাত্রটিকে ব'ল্‌বেন অন্য সব বিষয়ে যাই হোক্‌ এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহ'লে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ ক'র্‌তে কিছুমাত্র কৃপণতা ক'র্‌বে? যে-মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারি আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্য্যাদা হ'বে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জ্বেলে বিলিতি কাগজ প'ড়্‌চি এমন সময় খবর এলো একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেচে। বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়্‌লুম্‌। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম ক'র্‌লে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস ক'র্‌বে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম্‌, না তাকে কোনো কথা ব'ল্লুম্‌। সে ব'ল্লে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস ক'রে মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম্, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই—শাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কি বলি ভাব্‌চি এমন সময়ে সে ব'ল্লে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা ক'র্‌বেন না।"

আর যাই হোক্ দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম্ বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠেচে।

জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ ক'র্‌বে না।"

সে ব'ল্লে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশী—বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে ইংরেজি বানানের চেয়ে কঠিন তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ বলে মনে হ'লো না। আমি ব'ল্লুম্ "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেচি সে অবজ্ঞা ক'র্‌বার যোগ্য নয়।"

দীপালি ব'ল্লে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করিনে, কিন্তু আমি বিবাহ ক'র্‌বো না।"

আমি ব'ল্লুম্, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু না, আমাকে বিবাহ ক'র্‌তে ব'ল্‌বেন না।"

"আচ্ছা ব'ল্‌বো না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগ্‌তে পারি নে?"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে ক'ল্‌কাতায় নিয়ে যান তাহ'লে ভারি উপকার হয়।"

ব'ল্লুম্, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পা'র্‌বো।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে ইস্কুলের খবর আমি কি জানি! কিন্তু মেয়ে ইস্কুল স্থাপন ক'র্‌তে তো দোষ নেই।

দীপালি ব'ল্লে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ-কথার আলোচনা ক'রে দেখ্‌বেন?"

আমি ব'ল্লুম্, "আমি কাল সকালেই যাবো।"

দীপালি চ'লে গেলো। কাগজ পড়া আমার বন্ধ হ'লো। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে ব'স্‌লুম্। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্ কোটি

কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে ব'সে ব'সে বুন্‌চো ?

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হ'লো, তার মর্ম্ম এই :—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ ক'র্‌বার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য্য ক'র্‌লে তিনি তাকে ত্যাগ ক'র্‌বেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এতো বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ ক'র্‌বে এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনি গৃহে লালিত, দীপালির মতে সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হ'য়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না। এই নিয়ে তর্ক চ'ল্‌চে, কিছুতে তার মীমাংসা হ'চ্চে না। ঠিক এই সঙ্কটের সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেচি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফ্‌শিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে ব'ল্‌চে।

আমি ব'ল্লুম্‌, "যখন এসে প'ড়েচি তখন বেরোচ্চিনে। আর যদি বেরোই তা'হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে প'ড়্‌বো।

বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন হ'লো না। কেবলমাত্র পাত্র পরিবর্ত্তন হ'লো। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা ক'রেচি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হ'ন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হ'লো সে সন্তুষ্ট হ'য়েচে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিলো কিনা জানিনে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিলো, সেটা পূর্ণ হ'লো। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ ক'রে দিলে। তার গৃহদীপ আমার ক'ল্‌কাতার বাড়িতেই জ্ব'ল্‌লো। ভেবেছিলুম্‌ সময়মতো বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ ক'রে পূরণ ক'র্‌তে হবে। কিন্তু দেখ্‌লুম্‌ উপরওয়ালা প্রসন্ন হ'লে দুটো একটা ক্লাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাৎনীতে ভ'রে গেছে উপরন্তু একটি নাতিও জুটেচে। কিন্তু বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হ'য়ে গেছে—কারণ তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি। [ ১৩২৪—পৌষ ]

# নামঞ্জুর গল্প

আমাদের আসর জ'মেছিলো পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেচে; তা ছাড়া সেই অগ্নিদাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় সুরু হ'লো। সবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপুর পেরিয়ে পৌঁছলো আণ্ডামানের সমুদ্রকূলে। পারাণীর পাথেয় আমার যথেষ্ট ছিলো, তবু গ্রহের গুণে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমাপ্তি। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্য্যন্ত যাদের সর্ব্বোচ্চ প্রোমোশন হ'য়েছিলো, তাদের প্রণাম ক'রে আমি পশ্চিমের এক সহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুল্‌লেম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারী উকীল। উপাধি ছিলো রায়-বাহাদুর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা ক'রেই আমার বাড়ি বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিছিন্ন হ'য়েছিলো কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হ'য়েছিলো পকেটের সঙ্গে। মনি অর্ডারের সম্পর্ক পর্য্যন্ত ছিলো না। যখন আমি হাজতে তখনি মায়ের মৃত্যু হ'য়েছিলো। আমার পাওনা শাস্তিটা গেলো তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার স্বোপার্জ্জিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারো কারো মনে সংশয় আছে। তা'র কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিলো। তিনি

আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক্, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতার কালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হ'তো। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েচেন, সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বদ্ধ ছিলেন।

তাঁর আরো-একটি বন্ধন ছিলো। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তা'র মা ছিলো পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন ক'র্চেন—সে জানেও না যে, তিনি তা'রি মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়্লো, সে হ'চ্চে আমি স্বয়ং। যখন জেলখানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তা'র পরে বাবার দেহান্তে যখন জানা গেলো উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেননি, তখন সুখে-দুঃখে আমার পিসির চোখে জল প'ড়্লো। বুঝ্লেন, আমারপক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচ্লো। তাই ব'লে স্নেহ তো ঘুচ্লো না। তিনি ব'ল্লেন, "বাবা, যেখানেই থাকো, আমার আশীর্ব্বাদ রইলো।" আমি ব'ল্লেম, "সে তো থাক্বেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাক্তে হবে, নইলে আমার চ'ল্বে না। হাজৎ থেকে বেরিয়ে যে-মাকে আর দেখ্তে পাইনি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেচেন।" পিসিমা তাঁর এতোকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে ক'ল্কাতায় চ'লে এলেন। আমি হেসে ব'ল্লেম, "তোমার স্নেহ-গঙ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে বহন ক'রে এনেছি, আমি কলির ভগীরথ।"

পিসিমা হাস্লেন, আর চোখের জল মুছ্লেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু দ্বিধাও হ'লো; ব'ল্লেন, "অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিলো মেয়েটার কোনো-একটা গতি ক'রে শেষ বয়সে তীর্থ ক'রে বেড়াবো—কিন্তু বাবা, আজ যে তা'র উল্টো পথে টেনে নিয়ে চ'ল্লি।" আমি ব'ল্লুম্, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান করো না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ ক'র্বেন। তোমার যে পুণ্য আত্মা।"

সবচেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হ'লো। তাঁর আশঙ্কা ছিলো, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আণ্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুলিসের বাহুবন্ধনে বদ্ধ হবোই। তাঁর মৎলব ছিলো, যে-কোমল বাহুবন্ধন তা'র চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার জন্য তা'রই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে তিনি তীর্থভ্রমণে বা'র হ'বেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র-সম্বন্ধে এইখানে ভুল হিসেব ক'রেছিলেন। কুষ্ঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অস্তিমে আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে, নৈব নৈব চ। কন্যা-কর্ত্তারা ত্রুটি করেননি, তাঁহাদের সংখ্যাও অজস্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জান্‌তো, অতএব ইচ্ছা ক'র্‌লে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে ক'রে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে আদায় ক'র্‌তে পার্‌তেম। করিনি। আমার ভাবী চরিত্রলেখক একথা যেন স্মরণ রাখেন যে, সদেশসেবার সঙ্কল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা-খরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালীতে লেখা আছে ব'লে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্য্যন্ত আশা ছাড়েননি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রযুগের পরবর্ত্তী যুগের হাওয়া বইলো। পূর্ব্বেই ব'লেচি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চ'ল্‌চে। এতো নিস্তেজ যে পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্যে কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন ক'র্‌বার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিলো, কিন্তু ইদানিং আমার ভাগ্য-আকাশে লালপাগ্‌ড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকাতে তাঁর আর খেয়াল রইলো না। এইটেই ভুল ক'র্‌লেন।

সেদিন পূজোর বাজারে ছিলো খদ্দরের পিকেটিঙ্। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম—আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে

ছিলো, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিলো না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে-খবর আমার কুষ্ঠির নক্ষত্র ছাড়া আর সবার কাছে ছিলো অগোচর। এমন সময় খদ্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালী মহিলাকে পুলিশ সার্জ্জন দিলে ধাক্কা। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হ'ল। সুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হ'লো আমার গতি। তা'র পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠর-দেশে অবতরণ করা গেলো। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার কিছুকালের জন্যে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইলো না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ ক'রে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্‌টেলে; বাড়ীতেও দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক আছে, অতএব এখন তুমি দেবসেবায় ষোলো আনা মন দিলে দেবমানব কারো কোনো আপত্তির কথা থাক্‌বে না।"

জেলখানাকে জেলখানা ব'লেই গণ্য ক'রে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবীদাওয়া আবদার উৎপাত করিনি। সেখানে সুখ, সম্মান, সৌজন্য, সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হইনি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় ব'লে মনে ক'র্‌তেম।

মেয়াদ পুরো হবার কিছু পূর্ব্বেই ছুটি পাওয়া গেলো। চারিদিকে খুব হাততালি। মনে হ'লো যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজ্‌তে লাগ্‌লো, এন্‌কোর, এক্‌সেলেণ্ট্। মনটা খারাপ হ'লো। ভাব্‌লেম, যে ভুগ্‌লো সেই কেবল ভুগ্‌লো। আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মি'লে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দ্দা প'ড়ে যায়, আলো নেভে তা'র পরে ভোল্‌বার পালা। কেবল বেড়িহাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তা'রই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায় তা'র ঠিকানাও জানিনে। ইতিমধ্যে পূজোর সময় কাছে এলো। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। ব'ল্‌লেন, "ওহে, পূজোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।" জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "কবিতা?"

"আরে না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার একসংখ্যায় ধ'রবে না।"

"একসংখ্যায় কেন? ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছড়ানো হ'য়েছিলো। আমার জীবনচরিত সম্পাদকী চক্রে তেম্‌নি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের ক'রে দেবো।"

"না হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লি'খে দাও না।"

"কি-রকম ঘটনা?"

"তোমার সবচেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কি হ'বে লি'খে?"

"লোকে জান্‌তে চায় হে।"

"এতো কৌতূহল? আচ্ছা, বেশ, লিখ্‌বো।"

"মনে থাকে যেন, সব চেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ সবচেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি লোকের তা'তেই সবচেয়ে মজা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু নামটামগুলো অনেকখানি বানাতে হ'বে।"

"তা তো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা, তা'র ইতিহাসের চিহ্ন বদল না ক'র্‌লে বিপদ্ আছে। আমি সেইরকম মরীয়াগোছের জিনিষই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখো, তা'র পরে দরদস্তুর হ'বে।"

"কিন্তু আর কাউকে দিতে পার্‌বে না ব'লে রাখ্‌চি। যিনি যতো দর হাঁকুন্ আমি তা র উপরে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হ'বে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় ব'লে গেলেন, "তোমাদের ইনি, বুঝ্‌তে পার্‌চো? নাম ক'র্‌বো না, ঐ যে তোমাদের সাহিত্যধুরন্ধর—মস্ত লেখক ব'লে বড়াই; কিন্তু যা বলো তোমার স্টাইলের কাছে তা'র স্টাইল, যেন ডসনের বুট আর তালতলার চটি।"

বুঝ্‌লেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ্যমাত্র, তুলনায় ধুরন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

---

সন্ধ্যা কাগজ যেদিন থেকে প'ড়্‌তে সুরু, সেইদিন থেকেই আহারবিহার-সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাত্রার রিহার্সাল বলা হ'তো। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হ'য়ে উঠ্‌লো। তাই প্রথমবার যখন ঠেল্‌লে হাজতে, প্রাণ-পুরুষ বিচলিত হয়নি। তা'র পর বেরিয়ে এসে নিজের পরে কারো সেবা-শুশ্রূষার হস্তক্ষেপমাত্র বরদাস্ত করিনি। পিসিমা দুঃখবোধ ক'র্‌তেন। তাঁকে ব'ল্‌তেম, "পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মুক্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডাইয়ার্কি, দ্বৈরাজ্য, – সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।" তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে ব'ল্‌তেন, "আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত ক'র্‌বো না।" নির্ব্বোধ, মনে মনে ভাব্‌তেম বিপদ্ কাট্‌লো।

ভুলেছিলেম, স্নেহ-সেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তা'র মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান না যে লক্ষ্মী কোন্‌-একসময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বু'নে রেখেছেন, তা'র সোনার সুতোর দামে সূর্য্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন ভিক্ষের অন্ন খাচ্চি ব'লে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত, তখন জানেন না যে অন্নপূর্ণা এমন মস্‌লায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'র্‌তে থাকেন! আমার হ'লো সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'র্‌তে লাগ্‌লো, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্যমনস্ক চোখে প'ড়্‌লো না। মনে মনে ঠিক দিয়ে ব'সে আছি, তপস্যা আছে অক্ষুণ্ণ। চমক ভাঙ্‌লো জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও পুলিসের ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অদ্বৈতবুদ্ধিদ্বারা তা'র সমন্বয় ক'র্‌তে পারা গেলো না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগ্‌লেম, "নিস্ত্রৈগুণ্যো

ভবার্জ্জুন।" হায়রে তপস্বী, কখন্ যে পিসিমার নানাগুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাকযন্ত্রে প্রবেশ ক'রেছে, তা জান্‌তেও পারিনি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘ'টতে লাগ্‌লো।

ফল হ'লো এই যে বজ্রাঘাতছাড়া আর কিছুতে যে-শরীর কাবু হ'তো না, সে প'ড়্‌লো অসুস্থ হ'য়ে। জেলের পেয়াদা যদি বা ছাড়্‌লে জেলের রোগগুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেল-বেলা জ্বর হ'তে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হ'য়ে এসেছে, তখনো এ আপদ্‌গুলো টন্‌টনে হ'য়ে রইলো।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ ক'র্‌তে গেছেন, তাই ব'লে অমিয়াটার কি ধর্ম্মজ্ঞান নেই? কিন্তু দোষ দেবো কা'কে? ইতিপূর্ব্বে অসুখে-বিসুখে আমার সেবা ক'র্‌বার জন্যে পিসিমা তা'কে অনেকবার উৎসাহিত ক'রেছেন—আমিই বাধা দিয়ে ব'লেছি, ভালো লাগে না। পিসিমা ব'লেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই ব'ল্‌চি, তোর আরামের জন্যে নয়।" আমি ব'লেচি, "হাঁসপাতালে নার্সিং ক'র্‌তে পাঠাও না।" পিসিমা রাগ ক'রে আর জবাব করেননি।

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাব্‌চি, "না হয় একসময়ে বাধাই দিয়েচি, তাই ব'লে কি সেই বাধাই মান্‌তে হ'বে। গুরুজনের আদেশের পরে এতো নিষ্ঠা এই কলিযুগে!"

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অসুখ ক'রে প'ড়ে আছি ব'লে আজকাল দৃষ্টি হ'য়েছে প্রখর। লক্ষ্য ক'র্‌লেম আমার অবর্ত্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় তা'র এতো অভাবনীয় উন্নতি হয়নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজত্যাগিনী; ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ক'র্‌তেও তা'র হৃৎকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেম, অনিল তা'র এই কঠিন অধ্যবসায় দে'খে তা'কে দেবী ব'লে ভক্তি করে,—ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙ্গা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালীতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিলো।

আমাকেও ঐধরণের একটা-কিছু বানাতে হ'বে, নইলে অসুবিধা হ'চ্চে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ ক'রতো, হাতের কাছে কাউকে-না কাউকে পাওয়া যেতো। এখন একগ্লাস জলের দরকার হ'লে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান্ জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিরদিনের নিয়মবিরুদ্ধ হ'লেও রোগশয্যায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দুই-একবার ডাকিয়ে এনেচি; কিন্তু দেখ্‌তে পাই, পায়ের শব্দ শুন্‌লেই সে দরজার দিকে চ'ম্‌কে তাকায়, কেবলি উস্‌খুস্ ক'র্‌তে থাকে। মনে দয়া হয়, বলি, "অমিয়া আজ নিশ্চয় তোদের মীটিং আছে।" অমিয়া বলে, "তা হোক্ না দাদা, এখনো আর-কিছুক্ষণ"—আমি বলি, "না, না, সে কি হয়? কর্ত্তব্য সব আগে।" কিন্তু প্রায়ই দেখ্‌তে পাই, কর্ত্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তা'তে অমিয়ার কর্ত্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দম্‌কা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু ব'ল্‌তে হয় না। শুধু অনিল নয় বিদ্যালয়-বর্দ্ধক আরো অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্‌স্পিরেশন গ্রহণ ক'র্‌তে একত্র হয়। তা'রা সকলেই অমিয়াকে যুগলক্ষ্মী ব'লে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়-বাহাদুর, পাট করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে যার ভাগ্যে জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই ক'র্‌বার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝ্‌লেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্ব্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হ'য়ে না থাক্‌লে তা'কে মানায় না। খেতে শুতে তা'র সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ ক'রেই ঘটে। এপাড়ায় ওপাড়ায় খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে, এমন ক'র্‌লে শরীর টিঁক্‌বে কি ক'রে, সে একটুখানি হাসে—আশ্চর্য্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে, আপনি একটু বিশ্রাম করুনগে, একরকম ক'রে কাজটা সেরে নেবো,—সে তা'তে ক্ষুণ্ণ হয়,—ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা? দুঃখ-গৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা? তা'র ত্যাগ-স্বীকারের ফর্দ্দের মধ্যে আমিও প'ড়ে গেছি। আমি যে তা'র এতোবড়ো জেল-খাটা

দাদা, উল্লাসকর, কানাই, বারীন, উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হ'য়ে তা'র যে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হ'য়েছে, তা'কেও যথোচিত পরিমাণে দেখ্‌বার সে সময় পায় না। এতোবড়ো স্যাক্রিফাইস। যেদিন কোনো কারণে তা'র দলের লোকের অভাব হ'য়েছে সেদিন আমিও তা'র উৎসাহের মৌতাৎ জোগাবার জন্যে ব'লেছি, "অমিয়া, ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্যে নয়, তোর জন্যে বর্ত্তমান যুগ।" আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইচে—যারা আমাকে চেনে না তা'রা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর ব'লেই মনে করে।

বিছানায় একলা প'ড়ে প'ড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌চি, 'বিমুখা বান্ধবা যান্তি।' হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙ্‌লা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজ্‌ছিলো। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আব্রু নেই,—আধমরা তা'র অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তা'কে দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাব্‌ছিলেম এতোটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তা'কে তাড়ালেম কেন? বেগানা কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্ব্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে ব'লে। প্রাণের সঙ্গীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেসুরো, ওর রুগ্নতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এলো। চারদিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ—স্রোতের বাধা। সে দাবী করে, শিয়রের কাছে চুপ্ ক'রে ব'সে থাকো; প্রাণের দাবী, দিকে বিদিকে চ'লে বেড়াও। রোগের বাঁধনে যে নিজে বদ্ধ, অরোগীকে সে বন্দী ক'র্‌তে চায়,—এটা একটা অপরাধ। অতএব জীবলোকের উপর সব দাবী একেবারে পরিত্যাগ ক'র্‌বো মনে ক'রে গীতা খুলে ব'স্‌লেম। প্রায় যখন স্থিতধীঃ অবস্থায় এসে পৌচেছি, মনটা রোগ অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব ক'র্‌লেম, কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'র্‌লে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এ পর্য্যন্ত দূরের থেকেই সাধারণভাবেই তা'কে জানি; বিশেষভাবে তা'র পরিচয় জানিনে—তা'র নাম পর্য্যন্ত আমার

অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

তখন মনে প'ড়্‌লো, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে পারেনি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথাধরার, গায়ে ব্যথার ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর ক'রে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম ক'রে ব'স্‌লো। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে দুঃখ-স্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো বা দেশের সমস্ত মেয়ের হ'য়ে আমার পায়ের কাছে তারি প্রাপ্তি-স্বীকার ক'র্‌তে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেয়েছি, কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজ্‌লো। নির্ব্বিগুণ্য হবার উমেদার এই জেলখাটা পুরুষের বহুকালের শুক্‌নো চোখ ভিজে ওঠ্‌বার উপক্রম ক'র্‌লে। পূর্ব্বেই ব'লেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগ্‌তো না, ধ'ম্‌কে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখান করার স্পর্দ্ধা মনেও উদয় হ'লো না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্ম্মে পুজা অর্চ্চনায় তা'রা ছিলো তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্ম্মে তাদের না হ'লে তাঁর চ'ল্‌তো না। এ বাড়িতে আর সর্ব্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিলো, কেবল পুজোর ঘরে না। অমিয়া তা'র কারণ জান্‌তো না, জান্‌বার চেষ্টাও ক'র্‌তো না। পিসিমার মনে ছিলো, অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শি'খে এমন ঘরে বিয়ে ক'র্‌বে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবদ্বিজ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হ'তেই পারে না,—বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে? সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচার-হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দেননি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে

ক্লাসে সে হ'য়েছে ফার্স্‌ট্‌। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক্‌ প'রে বেণী দুলিয়ে চারটে-পাঁচটা ক'রে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হ'য়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন ক'র্‌তে যায় আর কি। এম্‌নি ক'রে পরীক্ষা দেবতার কাছে সিদ্ধির মানৎ ক'রে সে তারি সাধনায় দীর্ঘকাল তন্ময় ছিলো। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে পরীক্ষা-দেবীর বর্জ্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'ল। পাস্‌ গ্রহণেও যেমন, পাস্‌ ছেদনেও তেম্‌নি, কিছুতেই সে কারো চেয়ে পিছিয়ে থাক্‌বার মেয়ে নয়। পড়াশুনো ক'রে তা'র যে খ্যাতি, পড়াশুনো ছেড়ে তা'র চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেলো। আজ যে সব প্রাইজ তা'র হাতের কাছে ফির্‌চে, তা'রা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রুসলিলে গলে, তা'রা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়াগেঁয়ে পোষ্য মেয়েগুলির পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিলো না। অনাথাসদনে যে-সময়ে চাঁদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন ক'রেছে। পিসিমা ব'লেচেন, "সে কী কথা —এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী ক'র্‌তে? অনাথ হোক্‌ সনাথ হোক্‌ মেয়েরা চায় ঘর, সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী ক'রে রাখা কেন? তোমার যদি এতোই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি?"

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্চে, আমি সঙ্কুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সাম্‌নে ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগ্‌লেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবযুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার ক'র্‌তে চায়; আমার কাছে তা'রই সাহায্য আবশ্যক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত,—এই নিয়ে তা'রা একটা ধুমধাম ক'র্‌বে ব'লে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। তা'র দেশ-বিশ্রুত দাদা যদি একটু ইসারামাত্র ক'র্‌তে,

তা'হ'লে তা'র সেবা ক'র্‌বার লোকের কি অভাব ছিলো? এতো মানুষ থাক্‌তে শেষকালে কি এই——

থাক্‌তে পার্‌লে না। ব'ল্‌লে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—" প্রশ্নটা শেষ ক'র্‌তে না দিয়ে ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেল্‌লেম, "পায়ে বড়ো ব্যথা ক'র্‌ছিলো।"

পুলিস সার্জ্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ একমেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন ক'র্‌বার জন্যে মিথ্যে কথা ব'লে ফেল্‌লেম। এবারেও শাস্তি সুরু হ'লো। অমিয়া আমার পায়ের কাছে ব'স্‌লো। হরিমতি তা'কে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে কি-একটা ব'ল্‌লে সে ইষৎ মুখ বাঁকিয়ে জবাবই ক'র্‌লে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চ'লে গেলো। তখন অমিয়া প'ড়্‌লো আমার পা নিয়ে। বিপদ্‌ ঘ'ট্‌লো আমার। কেমন ক'রে বলি, দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতোদিন পর্য্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টেঁকে না বুঝি!

ধড়ফড় ক'রে উঠে ব'সে ব'ল্‌লেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জ্জমা ক'রে ফেলি।"

"এখন থাক্‌ না, দাদা। তোমার পা কাম্‌ড়াচ্ছে, একটু টিপে দিই না?"

"না, পা কেন কাম্‌ড়াবে? হাঁ হাঁ, একটু কাম্‌ড়াচ্ছে বটে। তা দেখ্‌ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কী ক'রে তোর মাথায় এলো, তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস্‌ "বর্ত্তমান যুগে ভাইয়ের ললাট অতি বিরাট্‌, সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তা'র স্থান হয় না।" এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লি'খে ফেলি। With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home. একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হ'য়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেলো। মাথাটা ধ'রে

ছিলো, লিখ্‌তে একটুও গা লাগ্‌ছিলো না—তবু এস্পেরিনের বড়ি গিলে ব'সে গেলেম।

পরদিন দুপুর-বেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ প'ড়্‌চে, গলির মোড় থেকে ভালুকনাচ-ওয়ালার ডুগ্‌ডুগি শোনা যাচ্চে, বিশ্রামহারা অমিয়া যখন যুগলক্ষ্মীর কর্ত্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জ্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা ক'র্‌তে ক'র্‌তে কখন হঠাৎ একসময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে ব'সে বাতাস ক'র্‌তে লাগ্‌লো। বোঝা গেলো, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখানা দে'খে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হ'লো না। এতক্ষণে নববঙ্গের ভাইফোঁটা-প্রচারের মীটিং ব'সেছে। অমিয়া ব্যস্ত থাক্‌বে। তাই ভাব্‌ছিলুম ভরসা ক'রে ব'লে ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা ক'র্‌চে। ভাগ্যে বলিনি।—মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত ক'র্‌চে, ঠিক সেই সময়ে অনাথাসদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট-হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগ্‌লো;—তা'র হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হ'লো না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তা'র পাখার গতি খুব মৃদু হ'য়ে এলো।

অমিয়া বিছানার একধারে ব'সে খুব শক্তসুরে ব'ল্‌লে, "দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কতো আশ্রয়হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হ'য়ে দিন কাটাচ্চে, অথচ সে সব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরী নয়। গরীব মেয়ে, যারা খেটে খেতে বাধ্য—এরা তাদেরই অন্ন-অর্জ্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে—যেমন আমাদের অনাথা-সদনের কাজ—তা হ'লে—"

বুঝ্‌লেম আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি ব'ল্‌লেম "অর্থাৎ তুমি চ'ল্‌বে নিজের সখ অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চ'ল্‌বে তোমার হুকুম অনুসারে; তুমি হ'বে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী। তা'র চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে, বুঝ্‌তে পার্‌বে সেকাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অভিভূত করা

সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবী নিজের উপরে করো, অন্তের উপরে ক'রো না।"

আমার ক্ষাত্রস্বভাব, মাঝে মাঝে ভুলে যাই, 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্'। ফল হ'লো এই যে অমিয়া পিসিমারই সদস্তদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির ক'র্‌লে,—তা'র নাম প্রসন্ন। তা'কে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপ্‌তে লাগ্‌লো। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ মুখে ব'লে যে, তা'র পায়ে কোনোরকম বিকার হয়নি? কেমন ক'রে জানায় যে, এমনতরো টেপাটেপি ক'রে কেবলমাত্র তা'কে অপদস্থ করা হ'চ্চে। মনে মনে বুঝ্‌লেম, রোগশয্যায় রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো নববঙ্গের ভাইফোঁটা সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে থেমে গেলো। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব ক'র্‌লে, অস্ত্রটা তারি উদ্দেশে। এ হ'চ্চে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চ'লে গেলো।

আবার আমাকে গীতা খুল্‌তে হ'লো। তবুও শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি—কিন্তু সেই একটুখানি ছায়া আর কোথাও দেখা গেলো না। তা'র বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরো দুইচারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবা ক'র্‌বার জন্তে জড়ো হ'লো। অমিয়া এমন ব্যবস্থা ক'রে দিলে, যাতে পালা ক'রে আমার নিত্যসেবা চলে। এদিকে শোনা গেলো, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না ব'লে ক'ল্‌কাতা ছেড়ে তা'র পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চ'লে গেছে।

---

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে ব'ল্‌লেন—"এ কী ব্যাপার? ঠাট্টা নাকি? এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা?"

আমি হেসে ব'ল্‌লেম, "পূজোর বাজারে চ'ল্‌বে নাকি ?"

একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হাল্‌কা-রকমের জিনিষ।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইচে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হাল্‌কা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এলো অনিল। ব'ল্‌লে, "মুখে ব'ল্‌তে পার্‌বো না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তা'র দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছে জানিয়েছে, একথাও ব'লেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তা'কে ব'ল্‌তে হ'লো। সহজে ব'ল্‌তেম না, কিন্তু জান্‌তেম, হীনবর্ণের পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ ক'রে থাকে। আমি তা'কে ব'ল্‌লেম্ পূর্ব্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই স্খলিত হ'য়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চো। সে পদ্ম, তা'তে পঙ্কের চিহ্ন নেই।"

নববঙ্গের ভাইফোঁটার সভা তা'র পরে আর জ'ম্‌লো না। ফোঁটা র'য়েছে তৈরী, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল ক'ল্‌কাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজপ্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েচে।

অমিয়া কলেজে ভর্ত্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুশ্রূষার সাতপাক বেড়ি থেকে আমার পা-দুটো খালাস পেয়েছে।

[ ১৩৩২—অগ্রহায়ণ ]

সমাপ্ত।